মুখবন্ধ

ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ অল্প কিছুদিন পূর্বে আমাকে বলেছিলেন যে সংস্কৃতি নিয়ে আমার সাথে কথা বলার অসুবিধে এই যে আলোচনাকালে একটা বিশেষ বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমি ঘুরতে থাকি এবং সেই কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হতে রাজী হই না। এক্ষেত্রে বিশেষ কক্ষপথে আবর্তনের অর্থ কী, সেটা দেখা দরকার।

হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় সমাজের অন্তর্গত মানুষদের মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য নেই, এ কথা আমি কোথাও বলিনি। এ বিষয়ে আমার বক্তব্যকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, 'হিন্দু' অথবা 'মুসলমান' কোন্ শ্রেণী-ভুক্ত এ কথা উল্লেখ না করে শুধু 'হিন্দু' অথবা 'মুসলমান' সংস্কৃতির আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং বিভ্রান্তিকর। দ্বিতীয়ত, পূর্বকালে অথবা বর্তমানে একই শ্রেণীভুক্ত হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে পার্থক্য, বিরোধ ও বৈষম্য দেখা গেছে, তার মধ্যেও মাত্রা এবং গুরুত্বের যথেষ্ট প্রভেদ। এই প্রভেদের কারণ উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্য, বিরোধ এবং বৈষম্য মৌলিক নয়—তার প্রায় ষোল আনাই স্থান কাল এবং আর্থিক জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং এ কারণেই তারা শাশ্বত নয়, সর্বাংশে পরিবর্তন-সাপেক্ষ।

আমার উপরোক্ত দুই বক্তব্যই বস্তুত একই সূত্রে গাঁথা এবং সেই সূত্রটি হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ধর্ম, বর্ণ, বংশ ইত্যাদি নয়—সে ভিত্তি মানুষের আর্থিক জীবন। আমার এই বক্তব্যই সেই কেন্দ্রবিন্দু, যার থেকে আমি বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নই বলে আলী আশরাফ সাহেব অভিযোগ করেছিলেন।

কতগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করলে এই বিন্দুটির গুরুত্ব সহজেই চোখে পড়বে। যেমন :

(ক) একই গ্রামের মুসলমান কৃষক, জমিদার এবং মহাজনের জীবন ও সংস্কৃতি কি এক?

(খ) যে কোন গ্রামের দরিদ্র হিন্দু কৃষকের এবং মুসলমান জমিদার অথবা-

জনের জীবন ও সংস্কৃতি, কোনটির সাথে সেই গ্রামের দরিদ্র মুসলমান কৃষকের জীবন ও সংস্কৃতির যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর ?

(গ) একজন উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী হিন্দু এবং একজন অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমান মহাজন, এ দুইয়ের মধ্যে কার সান্নিধ্য ও সাহচর্যে আলী আশরাফ সাহেবদের মতো একজন উচ্চশিক্ষিত নাগরিক মুসলমান ঘনিষ্ঠ হতে না পারলেও অন্ততপক্ষে অধিকতর 'স্বস্তি' বোধ করবেন ?

(ঘ) ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে এত আকাশ-পাতাল তফাৎ কেন দেখা গেলো ?

(ঙ) সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই প্রধানত নগরকেন্দ্রিক এবং নাগরিক ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ভূত কেন ?

(চ) স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা এত কম এবং উত্তর ভারতে তার সংখ্যা এত বেশী হয়েছিলো কেন ?

এ জাতীয় প্রশ্নের অন্ত নেই। কিন্তু এই ধরনের বাস্তব প্রশ্নগুলিকে পরীক্ষা করলেই আর্থিক জীবনের অপরিসীম গুরুত্ব এবং হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি ও সম্পর্কের সত্যিকার চরিত্র উদ্ঘাটিত হবে।

আলী আশরাফ সাহেব আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যদি মৌলিক পার্থক্য নাই থাকবে, তাহলে ইংরেজ রাজত্বকালে তাদের আর্থিক জীবন এবং রাজনীতি এত ভিন্ন হবে কেন ? সাংস্কৃতিক পার্থক্য থেকেই তো তার উৎপত্তি।'

এ কথা এক হিসেবে সত্যি, কিন্তু আর এক হিসেবে মিথ্যা। কারণ, সত্য বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন : (ক) দুই দুইয়ে চার হয় (খ) মানুষ মরণশীল (গ) পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করে (ঘ) পদ্মানদী রাজশাহী শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। আমরা মনে করি আলী আশরাফ সাহেবের বক্তব্য (ঘ) শ্রেণীর সত্য, কিন্তু তাঁরা তাকে মনে করেন (ক) শ্রেণীর। কাজেই যে সত্য অপসৃয়মান এবং স্থানকালনির্ভর তাকেই তাঁরা শাশ্বত আখ্যা দিয়ে নানা বিষয়ের নিত্য নতুন ব্যাখ্যা দানে প্রবৃত্ত হন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক জীবনের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য বরাবরই থেকেছে। কিন্তু সে

পার্থক্যগুলি মোটেই মৌলিক নয় এবং সেগুলির কারণেই মূলত হিন্দু-মুসলমান বিভেদের উৎপত্তি হয়নি। ভারতবর্ষে মোগল আমলে উচ্চশ্রেণীর যে মুসলমানেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁরা ইংরেজ রাজত্বে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে এক মুক্তি মিথ্যার জন্ম দান করেছিলেন। এই মিথ্যা প্রচারণার ফলে সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা কতকগুলি ভুল করে বসেন। এ জাতীয় ভুল ইতিহাসে শুধু যে মুসলমানরাই করেছিলেন, তা নয়। তুলনীয় অবস্থায় এ জাতীয় ভুল করাটাই নিয়ম এবং না-করাই ব্যতিক্রম। এজন্যে সাধারণ মুসলমানেরা শুধু যে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেই এ ধরনের মিথ্যার মোহে আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তা নয়। এ বিভ্রান্তি তাঁদের ইংরেজ রাজত্বের শেষ পর্বেও হয়েছিলো। এই মিথ্যার মহিমাতেই বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান কৃষক-শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করে সমবেত হয়ে ছিলেন মুসলিম লীগের পতাকাতলে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম অধ্যায়ে ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সামন্তশক্তি এবং তাদের তাঁবেদাররা যে মিথ্যাগুলি প্রচার করেছিলো তার মধ্যে প্রধান ছিলো 'মুসলমানদের' সাম্রাজ্য হারানোর কথা। মোগল সাম্রাজ্যের দেশীয় চরিত্রকে অগ্রাহ্য করে তার ধর্মীয় চরিত্রের উপরই এক্ষেত্রে তারা গুরুত্ব আরোপ করেছিলো। অর্থাৎ তাদের মতে মোগল সাম্রাজ্য আসলে ভারতীয় ছিলো না, ছিলো মুসলমানদের রাজ্য। কাজেই ইংরেজ রাজত্বে সমস্ত মুসলমান সমাজই হলো রাজ্যহারা—'রাজার জাতি' থেকে তারা পরিণত হলো প্রজার জাতিতে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রতি সাধারণ হিন্দুদের এই মনোভাবের কোন কারণই ছিলো না, তাই তারা নতুন পরিস্থিতির সাথে সহজেই নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিলো। এজন্যেই মুসলমানদের সাথে ইংরেজ এবং সেই সঙ্গে হিন্দুদের শুরু হলো এক বৈরিতার সম্পর্ক।

অধিকৃত অবস্থায় ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক তিনটি পর্যায় উত্তীর্ণ হয়। প্রথম পর্যায়ে বৈরিতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে সহযোগিতা এবং তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে আবার বৈরিতা। ইংরেজদের সাথে হিন্দুদের এই সম্পর্কের প্রধানত দুই পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে সহযোগিতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে অসহযোগিতা ও বৈরিতা।

কাজেই মুসলমানরা ইংরেজদের বিরোধিতা করেছে এবং হিন্দুরা তাদের

পদলেহনে ব্যস্ত থেকেছে, এ তথ্যবিবৃতি মোটেই ঐতিহাসিক নয়। ইংরেজদের সাথে যে সহযোগিতার প্রয়োজন হিন্দুরা প্রথম দিকে অনুভব করেছিলো, সেই সহযোগিতার আবেদনেই স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ মুসলমান নেতারা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কাজেই ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই করতে হয়েছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। যে শ্রেণীর হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে এই সহযোগিতা করেছে সেই শ্রেণীর মুসলমানরাই এগিয়ে গেছে সেই একই সহযোগিতার উদ্দেশ্যে। আবার যে মুসলমান সামন্ত ভূস্বামী এবং ফৌজী আমলারা ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলো, সেই শ্রেণীর হিন্দু সামন্ত ভূস্বামী এবং ফৌজী আমলারাও বিরোধিতা করেছিলো ইংরেজদের। এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থানই তার সর্বপ্রধান উদাহরণ।

ইংরেজদের সাথে হিন্দুদের যে সহযোগিতার কথা বলা হয় সেটা পুরাতন হিন্দু সামন্ত শক্তির থেকে আসেনি এবং তা আসেনি বলেই তারা ব্যবস্থা করেছিলো ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের। এ প্রয়োজন বাংলাদেশে বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় এখানেই তারা সে ব্যবস্থা কায়েম করেছিলো। এর ফলে যে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা হয়েছিলো তা অস্বীকারের উপায় অথবা প্রয়োজন কোনটাই নেই। কিন্তু এছাড়াও তাদের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো নতুন একটি পরাভূত দেশে তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হলো, তারা হিন্দু, মুসলমান, যাই হোক, তাতে ইংরেজের কোন আপত্তি ছিলো না। কিন্তু বাস্তবত দেখা গেলো যে তাদের মধ্যে বিপুল অধিকাংশই হলো হিন্দু। ইংরেজদের মুসলমান বিরোধিতার ফলে সেটা হয়নি। তার আসল কারণ, নতুন বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্যে যে টাকার দরকার, সেটা মুসলমানদের হাতে ছিলো না। শুধু মুসলমানদের কেন, মোগলযুগের হিন্দু জমিদার, ফৌজী অফিসার অথবা আমলাদের পরিবারভুক্ত লোকদের হাতেও সে টাকা ছিলো না।

যে সমস্ত হিন্দুরা নতুন ব্যবস্থায় জমিদার হলো তাদের পূর্বপুরুষরা জমিদার ছিলো না। তারা ছিলো প্রধানত বেনিয়ান মহাজন শ্রেণীভুক্ত। মহাজনী ও ব্যবসার দ্বারা অর্থ উপার্জনের ফলে তাদের হাতে নগদ টাকা ছিলো এবং সেই

অর্থ দিয়েই তারা নতুন বন্দোবস্তে জমিদারী স্বত্ব লাভ করেছিলো। মুসলমানরা ধর্মীয় নিষেধের জন্যে সুদের কারবার থেকে বিরত থাকার ফলে তাদের হাতে এ জাতীয় অর্থ ছিলো না, কাজেই তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলভোগ থেকে বঞ্চিত হলো।

এর থেকে কিন্তু এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, মুসলমানদের সাথে হিন্দু এবং ইংরেজদের সংঘর্ষ ও মনোমালিন্যের প্রধান কারণ ধর্মীয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্যের পর এই মন্তব্যকে প্রথম দৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও মন্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করলে তার অর্থ বোঝা সহজ হবে।

মোগল, পাঠান ইত্যাদি মুসলমান আমলে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর মুসলমানদের সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক, সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক শোষণকার্যের সুবিধার ফলে তাদের মধ্যে মহাজনী সুদী কারবারের দ্বারা অর্থ রোজগারের কোন তাগিদ ছিলো না। এজন্যেই সুদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে তাদের অসুবিধা হতো না। কিন্তু আফগানিস্তানের অনুর্বর ভূমি এবং দুরূহ জীবনযাত্রা সুদের প্রতি সে দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যভাবে গঠন করেছিলো। তাদের আর্থিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কেন সেখানকার সাধারণ মুসলমানরাও অনেকে বিদেশে সুদী কারবারে অভ্যস্ত। এই সুদখোর কাবুলীওয়ালারা মুসলমান নয়, এ কথা বললে ভুল করা হবে। একদিকে তারা সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কোন কারণ যেমন দেখে না, অন্যদিকে তেমনি কোথাও ইসলামের সামান্য অবমাননা ঘটলে তারা জীবন দান করতে পর্যন্ত প্রস্তুত থাকে।

কিন্তু শুধু কাবুলীওয়ালারা কেন, আমাদের দেশের মুসলমানরা মোগল-পাঠান আমলে সুদ খেতো না, এ কথা সত্যি হলেও মুসলমানরা যে সুদ একেবারে না খাওয়ার পক্ষপাতী, সেটাও ঠিক নয়। পূর্বে যে কাজ তাদের দ্বারা সম্ভব হতো না, বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে কাজই তাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে। আলী আশরাফ সাহেবদের মতো বিপুলসংখ্যক পরহেজগার মুসলমান 'ইসলামী' রাষ্ট্র পাকিস্তানের ব্যাঙ্কসমূহে নিজেদের টাকা রেখে তার থেকে উপযুক্ত সুদ নিতে আজ আর আপত্তি করছেন না। কাজেই বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, মুসলমানদের সুদ খাওয়া না-খাওয়ার বিষয়টি কোন অলঙ্ঘনিয়মে বাঁধা অথবা মৌলিক ব্যাপার নয়।

মুসলমানরা সুদ খাবে কি খাবে না, সেটা নির্ভর করবে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর। সামন্ততান্ত্রিক মোগল সাম্রাজ্যে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে সুযোগ ও প্রয়োজনের অভাবে যে কাজ করতে তারা নারাজ ছিলো, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা সে কাজ করতে রাজী। দু-চারজন নগণ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত এদিক দিয়ে এখন হিন্দু-মুসলমান বিত্তশালী লোকদের মধ্যে ধর্মপার্থক্য সত্ত্বেও কোন তফাৎ নেই।

এজন্যেই পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হিন্দু-মুসলমানের অনেক পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে এবং সেগুলি সত্য হলেও তারা কোন অর্থেই মৌলিক নয়, সর্বাংশে পরিবর্তনসাপেক্ষ এবং দেশকালের উপর নির্ভরশীল। সুদ খেতে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পরহেজগার মুসলমানরা আজ আপত্তি করেন না, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই সুদ খাওয়ার মতো সাহস মোগল যুগের সামাজিক অবস্থায় ধর্মে অবহেলাকারী কোন মুসলমানেরও ছিল না। যে ধর্মীয় অনুশাসন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক জীবনকে পর্যন্ত কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতো, সেই অনুশাসনই নতুন ও বৃহত্তর আর্থিক জীবনের চাপে আর কার্যকরী হচ্ছে না। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় যে ধর্মীয় আচরণ সম্ভব ছিলো, ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেটা আর সম্ভব নয়।

এটা যে শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তা নয়। ইওরোপীয় খৃষ্টানদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই জিনিসই ঘটতে দেখা গেছে। সামন্তযুগে তারাও সুদ গ্রহণের দারুণ বিরোধী ছিলো। কিন্তু ইওরোপে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ও উন্নতির সাথে সাথে সুদের প্রতি তাদের মনোভাবও পরিবর্তিত হয়েছিলো এবং সুদ খাওয়ার 'নিয়ত' করে নিয়েই তারা প্রবৃত্ত হয়েছিলো সুদের প্রকারভেদ নির্ণয় দ্বারা সুদ সম্পর্কিত নিত্য নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারে—যেমনটি আজকাল দেখা যাচ্ছে মুসলমান তাত্ত্বিকদের মধ্যেও। এখানে তত্ত্বটা আসল কথা নয়। আসল কথা হলো সুদ খাওয়ার সিদ্ধান্ত। সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক জীবনে ভারতীয় মুসলমানদের যা প্রয়োজন ছিলো না, তাই প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এই প্রয়োজনের তাগিদেই সুদ-সম্পর্কিত নানা নতুন তত্ত্বের আবির্ভাব, ধর্মীয় তাগিদে নয়।

ইসলামী ধর্মশাস্ত্র মতে সুদের প্রশ্ন নিঃসন্দেহে মৌলিক। সেই সুদ খাওয়া অথবা না-খাওয়ার প্রশ্নটি পর্যন্ত যখন দেশের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল,

তখন চোগাচাপকান পরা, শুক্রবারে আদম সন্তানকে ভিক্ষাদান করা, ভিক্ষুকে আণ্ডা বলা, গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখা ইত্যাদি মুসলিম সংস্কৃতির তথাকথিত বৈশিষ্ট্যগুলির বাস্তব ভিত্তি যে কত দুর্বল এবং অপসৃয়মান, সে কথা বলাই বাহুল্য।

অনেকের মতে, আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লেখালেখির আর প্রয়োজন নেই, কারণ এদেশে তার প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ জাতীয় বক্তব্য সত্যি হলে সুখের বিষয় হতো কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকে অবহেলা করা অথবা তার সম্পর্কে উদাসীন থাকার মতো অবস্থা আমাদের দেশে এখনো সৃষ্টি হয়নি।

এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র ও ভূমিকা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। এবং এই পরিবর্তনই অনেকের মনে উপরোক্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে দায়ী। স্বাধীনতার পূর্বে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার মুনাফাভোগী ছিলো সমগ্র হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়াশ্রেণী। তাতে কৃষক-শ্রমিকের কোন লাভ ছিলো না। কিন্তু তবু তারা সাম্প্রদায়িক সংগঠন-গুলির সাথে যুক্ত হয়েছিলো বিভ্রান্তিকর প্রচারণার ফলে। এর দ্বারা আর্থিক দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে যে সমস্ত আন্দোলন অথবা দাঙ্গা হাঙ্গামা হতো, সেগুলি-কেও সাম্প্রদায়িক বলে চালিয়ে দেওয়া হতো। এই প্রচেষ্টা উনিশ শতকের আশীর দশক থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

যে কোন আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে বাস্তব ও বিষয়ীভূত, এই দুই অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রথম অবস্থা ব্যতীত দ্বিতীয় অবস্থার উদ্ভব সম্ভব নয়, কাজেই সেদিক থেকে তার গুরুত্ব মৌলিক হলেও দ্বিতীয়টি ব্যতীত কোন আন্দোলনকেই তার সঠিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেওয়া চলে না। এই বিষয়ীভূত অবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্ব সর্বাধিক। সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে অবশ্য এক্ষেত্রে শুধু সাহিত্য সঙ্গীত-নৃত্যচর্চা না বুঝিয়ে বোঝায় সমগ্র মানসিক পরিমণ্ডলকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে যে আন্দোলন করেছিলো সেখানে প্রয়োজন ছিলো উপযুক্ত মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে কৃষক-শ্রমিকের দৃষ্টিকে

যথাসম্ভব শ্রেণী-সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করে তাকে সাম্প্রদায়িক কাঠা-মোর মধ্যে আবদ্ধ রাখা। এইভাবেই মালাবারের মোপলা উত্থানকে সাম্প্র-দায়িক আখ্যা দিয়ে ১৯২১ সালের গণ আন্দোলনকে ধ্বংস করা হয়েছিলো। এইভাবেই বাংলাদেশের কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রামকে তিরিশের যুগের কৃষক আন্দোলনের 'প্রাতঃস্মরণীয়' নেতারা মধ্যবিত্ত স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে নিজেদের সাম্প্রদায়িক আবর্তের মধ্যে সুকৌশলে আকর্ষণ করেছিলেন। সেই একইভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাম্প্রদায়িকতার আবর্তের মধ্যে পূর্ব বাংলার জন-সাধারণকে নিক্ষেপ করে মুসলিম লীগ সরকার তাদের জিহ্বা ছেদনের চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয়েছিলো, জবানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ, জিহ্বা ও খাদ্যের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে সমগ্র আর্থিক জীবনের সম্পর্ক তেমনি নিবিড়, এবং গভীর—এই সত্যের উপলব্ধি তাদের মধ্যে এসেছিলো। কাজেই শেষ পর্যন্ত ইসলামী তমদ্দুনের নামে উর্দুকে বাংলা ভাষাভাষী পাকিস্তানীদের উপর চাপানোর সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা এদেশে ব্যর্থ হলো। রাষ্ট্রভাষা আন্দো-লনের এখানেই অপরিসীম গুরুত্ব। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্য-বিত্তরা সর্বপ্রথম লাভ করলো একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিত এবং তাদের মধ্যে এলো অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ও রাজনীতি চর্চার এক নতুন এবং অভূতপূর্ব প্রেরণা। এই প্রেরণা তাদের মধ্যে অকারণে আসেনি। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সাম্প্রদায়িকতার মূল ভিত্তি ছিলো হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্তের আর্থিক জীবনের বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করার জন্যেই প্রধানত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। তাই পাকিস্তানের নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দু মধ্যবিত্তের থেকে এ জাতীয় কোন বাধা-বিপত্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলো। কিন্তু সে বাধা-বিপত্তি নতুন করে দেখা দিলো পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক বুর্জোয়া, আমলা, বেনিয়া, রাজনীতিকদের থেকে। কাজেই পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের দৃষ্টি হিন্দুদের থেকে ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে নিবদ্ধ হলো এই নতুন উৎ-পাতের প্রতি। এভাবেই ১৯৪৭ সালের পর মুসলমান বাঙালী মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সূত্রপাত হলো এক নতুন চেতনার। এর ফলে এদেশের মধ্যবিত্তের জীবনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূল ভিত্তি অপসারিত হলো সত্যি কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না হয়ে তা পরোক্ষভাবে

জীবন্ত রইল এবং এই নতুন পরিস্থিতিতে তার উৎসভূমি হলো পাকিস্তানের বৃহৎ বুর্জোয়া। এই স্বার্থের তাগিদেই আজ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাকে জীবন্ত রাখা হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক জীবনেও নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক এবং অগণতান্ত্রিক আন্দোলনের আবর্তে ফেলে বিষাক্ত করে তোলার আয়োজন চলেছে। এজন্যেই দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে পাকিস্তানে আমলা-বেনিয়া-বৃহৎ বুর্জোয়া প্ররোচিত সমস্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাহ্যিক রূপ যাই হোক, তার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থ। এই সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র নিক্ষেপ করেই তারা ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করতে চায়। সেদিক থেকে এই শ্রেণীর ভূমিকা আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিতই আছে।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালবর্তী এলাকা থেকে আজ সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের দিক নির্দেশের ফলে অনেকে বিভ্রান্তিবশত মনে করছেন যে, এদেশে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতিসাধন-ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনের বিবিধ আন্দোলনের বিশ্লেষণ করলে এই ভ্রান্তি সহজেই দূর হবে। এবং এই কর্তব্যে গাফিলতী দেখা দিলে এদেশে প্রগতিশীল আন্দোলন সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়বে।

এ বইয়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে "মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন" এবং "ভাষা ও বানান সংস্কারের রাজনীতি" 'দৈনিক সংবাদে', "বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ" এবং "অক্টোবর বিপ্লব ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে" সৃজনী শিল্পী ও সাহিত্যগোষ্ঠীর সংকলন 'সৃজনী' ও 'জয়ধ্বনী'তে, "বাংলা সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব" চট্টগ্রাম ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংকলন 'পদাতিকে', "গোর্কী জন্মশতবার্ষিকীতে" রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'বনানী'তে এবং "সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ঐতিহাসিক পটভূমি" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা 'ইতিহাসে' ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি অনেকাংশে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের "সমাজতন্ত্র : কল্পলৌকিক ও বৈজ্ঞানিক"-এর অনুসরণে লিখিত। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অবশ্য এতে বিস্তৃত কোন আলোচনা নেই কারণ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পটভূমি আলোচনাই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। এই আলোচনার ফলে আমাদের দেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক, আধিমানসিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে তার যথার্থ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে

বিচার করার স্থবিধে হবে বলে আশা করি।

বইটি ছাপার সময় শ্রীমান শুভ রহমান ও শ্রীমতি লুসিল সাদিকিন প্রুফ দেখার কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। মুদ্রক হিসেবে শ্রীমান সাদিকিনকে অনেক অতিরিক্ত ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে। শ্রীমান নিয়ামত হোসেন বইটির প্রচ্ছদ অল্প সময়ের মধ্যে এঁকে না দিলে এর প্রকাশনা আরও বিলম্বিত হতো। এদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ছাপার ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রকাশক শ্রীমান আবু নাহিদকে যে পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে তার জন্যেও আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এদেশে সাম্প্রদায়িকতার মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি পাকিস্তানী আমলেই অপসারিত হয়েছিলো এবং তার ফলে সেই আমলেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি এখানে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলো। কিন্তু সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব দ্রুত কমে এলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই যে কত দুর্বল ছিলো তা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সুস্পষ্ট হলো। ভারত সরকার বিরোধিতার সাথে হিন্দু বিরোধিতা একাকার হয়ে এদেশে আবার নব পর্যায়ে উত্থান ঘটলো সাম্প্রদায়িকতার।

সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্নমুখী চরিত্র ও প্রভাব সম্পর্কে সজ্ঞান ও সচেতন হওয়ার গুরুত্ব যে পাকিস্তানী আমলের থেকে বাংলাদেশে কিছুমাত্র কমে নি, উপরন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে, এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে সেটা বোঝার কোন অসুবিধে আর নেই।

'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'তে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয়েছে তার গুরুত্ব আমাদের সমাজে আগের মতই বর্তমান আছে। সেদিক থেকে বইটির পুনঃপ্রকাশ আশা করি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ অনেক আগেই প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু নানা বাস্তব অসুবিধার জন্যে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দায়িত্ব নিয়ে এটি প্রকাশ করার জন্যে আমি আহমদ আতিকুল মাওলার কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর

আবদুর রাজ্জাক

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা

'ভারতবর্ষে বিপরীতধর্মী জাতির মোকাবেলায় মুসলমানের নিজস্ব তহজীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে শঙ্কিত ও সচেতন থাকতে হোত। সামান্য পদস্খলন হলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এ ভয় ছিল। প্রতিপক্ষের সাংস্কৃতিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় নিয়ে তাঁরা ছিলেন চিন্তিত। ছোটকালে ঢাকায় দেখেছি মসজিদের সামনে কোন বাজনা বাজানো চলত না। হিন্দু পর্বের সময় এ নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে পর্যন্ত। আজকাল মুসলমানেরাই সামাজিক আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে নির্বিবাদে রাস্তাঘাটে বাজনা বাজায়। নামাজের সময়ে পর্যন্ত এ বাজনার বিরতি ঘটে না। কিন্তু তা নিয়ে ধর্মীয় কারণে কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এ খবর শুনিনি। আমাদের জীবন এতে নানা ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে; শহরে গোলমাল বেড়েছে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ঢাকার মুসলমান সমাজের ঔদাসীন্যের প্রমাণ হিসাবে এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য কিনা সন্দেহ। কথা এই যে, পূর্বে আপত্তি হোত বাদকদল হিন্দু বলে। তাদের হাতে ইসলাম অপমানিত হবে এটা কেউ বরদাশত্ করতে রাজী ছিল না। পাকিস্তানে এসেছে ইসলাম সম্পর্কে একটা নিরাপত্তার ভাব! দু-একজন বাদক মসজিদের সামনে বাজনা বাজালেই ইসলাম বিপন্ন হবে একথা কেউ ভাবে না।'*

উপরের উদ্ধৃতিটির মধ্যে যে মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে তারই নাম সাম্প্রদায়িকতা। এখানে লেখকের বক্তব্যকে বিচার করলে দেখা যাবে যে তাতে সত্যিকার ধার্মিকতার কোন স্থান নেই। অর্থাৎ ধর্মের সত্যিকার মর্যাদা রক্ষার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ নেই কিন্তু ধর্মকে ঐহিক স্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ব্যগ্রতা আছে। পাকিস্তান-পূর্ব যুগে মসজিদের সামনে বাজনা

* আমার 'সাম্প্রদায়িকতা' নামক বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডক্‌টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। 'পূর্বমেঘ', বর্ষ ৭, ১-২ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭৩। পৃষ্ঠা ৬৯-৭০

বাজানোর ফলে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতো তার প্রতি লেখকের অকুণ্ঠ সমর্থন কারণ সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে সমর্থন না করলে সেটা পদস্খলনের সামিল এবং সামান্ত পদস্খলন হলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, উল্লিখিত 'বিপদ' যদি ধর্মসম্পর্কীয় হতো তাহলে আজকাল 'নামাজের সময়ে পর্যন্ত বাজনার বিরতি না ঘটলে' যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ ছিলো। কিন্তু উদ্ধৃত অংশটির লেখকের অন্তরে সে আশঙ্কাবোধ একেবারেই নেই। এর সরল অর্থ মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোর মধ্যে আত্যন্তিক-ভাবে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ তার ফলে ধর্মের প্রকৃত অবমাননা হয় না। অবমাননা হয় তখনই যখন সেই বাজনা বাজায় অমুসলমান। হিন্দু এ বাজনা বাজালে সেটা হয় সাংস্কৃতিক আক্রমণ, কিন্তু মুসলমান সে কাজ করলে তার সাত খুন মাফ!

এ আক্রমণ তাহলে কী জাতীয় সাংস্কৃতিক আক্রমণ? এর চরিত্র বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যাবে যে এটা আর যাই হোক ধর্মীয় নয়। তাহলে বাদকদল হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যাই হোক মসজিদের সামনে নামাজের সময় বাদ্যবাদনে আপত্তির কারণ থাকতো।

কিন্তু আক্রমণটি যদি ধর্মীয় না হয় তাহলে তা কোন্ প্রকৃতির 'সাংস্কৃতিক আক্রমণ'? এ প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ যাঁরা এ ধরনের আক্রমণকে সাংস্কৃতিক আক্রমণ আখ্যা দেন তাঁদের সংস্কৃতির মূল ব্যাখ্যা বাহ্যত ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

দুই

আলোচ্য উদ্ধৃতিটির লেখক 'ধর্ম' এবং 'সংস্কৃতি'কে প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং বিপরীত দাবী সত্ত্বেও এই বিচ্ছেদই সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম প্রধান চরিত্রলক্ষণ। অর্থাৎ যে মানুষ সাম্প্রদায়িক তাকে ধার্মিক হতেই হবে এমন কথা নেই। শুধু তাই নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কাছে ধর্মের তত্ত্ব এবং ব্যবহার নিতান্তই গুরুত্বহীন। এজন্যেই দেখা যায় যে সাম্প্রদায়িক মনো-ভাবাপন্ন মানুষ, সে হিন্দুই হোক অথবা মুসলমান, কদাচিৎ ধর্মনিষ্ঠ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন শুধু যে ধর্মনিরপেক্ষ তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে ধর্মবিমুখ।

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির এখানেই মূল বিরোধিতা। একদিকে তা চিন্তার কাঠামোকে জোরপূর্বক ধর্মের ওপর স্থাপন করতে চায় আবার অন্যদিকে সংস্কৃতির নামে তা মানুষের চিন্তাকে চালনা করে ধর্মহীন ঐহিকতার দিকে। এ দুই প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বিতীয়টিই সর্বাংশে প্রধান, কারণ একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির তথাকথিত ধর্মানুগত্য ধর্মীয় আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মকে তার প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রয়োজনের চরিত্র স্বতন্ত্র। সাম্প্রদায়িকতাবাদীর কাছে ধর্ম তাই জীবনযাপনের পদ্ধতি নয়, তা হলো ক্ষুদ্র ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার।

এইসব কারণে দেখা যায় ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনেক কিছু বললেও সংস্কৃতি বলতে তারা আসলে যা বোঝাতে চায় ধর্মের সাথে তা সম্পর্কহীন। তাদের সংস্কৃতিচর্চার লক্ষ্য ধর্মের গৌরববর্ধন নয়, আসলে তা হলো ধর্মের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য জ্ঞাপনকারী লোকদের শ্রেণী-স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে সহায়তার আয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিসেবীদের মতো তারাও নিজেদের জীবনে ধর্মের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে, কিন্তু প্রথমোক্তদের মতো তারা সেটা সরাসরি এবং সততার সাথে কবুল করতে নারাজ। সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের সাথে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এখানেই প্রকৃত পার্থক্য। ধর্মনিষ্ঠ মানুষ সত্যি-সত্যি ধর্মে বিশ্বাস করে এবং ব্যবহারিক জীবনকেও সেই বিশ্বাসের দ্বারা করে নিয়ন্ত্রিত। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে না এবং তার ব্যবহারিক জীবনেও ধর্মের কোন প্রভাব থাকে না। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এর কোনটাই নয়। তারা বোঝাতে চায় যে, তত্ত্বগতভাবে তারা ধর্মানুগত কিন্তু তাদের ব্যবহারিক জীবনে সে আনুগত্যের কোন দেখা মেলে না। এ কারণেই সত্যিকার ধর্মনিষ্ঠ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির জীবনে সাধারণভাবে সততার একটা স্থান থাকলেও সাম্প্রদায়িকতাবাদীর জীবন অসৎ এবং মিথ্যাময় হতে বাধ্য।

তিন

ধর্মকে শোষণের কাজে ব্যবহার কোন নতুন কথা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সেটা হয়েছে। প্রত্যেক পর্যায়েই দেখা গেছে যে, অধিকসংখ্যক

মানুষ ধর্মে সততার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অল্পসংখ্যক লোকে সে বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে। এভাবেই ধর্ম পরিণত হয়েছে শোষণের হাতিয়ারে। ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা থেকে তাই দেখা যায় যে মানুষ ধর্মচর্চা করলেই সে খারাপ এ কথার কোন ভিত্তি নেই। পৃথিবীতে অগণিত শোষিত মানুষই আবহমানকাল থেকে ধর্মচর্চা করে আসছে এবং তারা খারাপ এবং অসৎ এ কথা বলা মূঢ়তা ব্যতীত কিছুই নয়। কিন্তু তার অর্থ আবার এই নয় যে, ধর্মচর্চাকারী মানুষ সঠিক পথের অনুসারী। এর অর্থ এই যে, ধর্মচর্চা করা এবং ধর্মকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এ দুই মনোবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ আছে। এবং যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার ক্ষেত্রেই এ প্রভেদকে স্বীকার করা প্রয়োজন।

যারা ধর্মচর্চা করে তারা অধিকাংশই শোষিত এবং অশিক্ষিত। ধর্মচর্চা শোষণ ও অশিক্ষার মতোই তাদের জীবনের ভূষণ। তাই শোষণ ও অশিক্ষাকে যেমন তারা জীবন থেকে সহজে বাতিল করতে পারে না ধর্মকেও তেমনি বর্জন করা তাদের সাধ্যাতীত। এগুলির অস্তিত্ব তাদের জীবনে প্রায় সমান্তরাল এবং সমকালস্থায়ী।

ধর্মনিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িকতার এই পার্থক্যকে যথাযথভাবে নির্ণয় করা এজন্যেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মকে যারা শোষণের কাজে ব্যবহার করেছে অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠ মানুষদেরকে যারা চিরকাল শোষণ করে এসেছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদেরই ঐতিহ্যবাহী, এদেশে তারা তাদেরই আধুনিক ও সমসাময়িক সংস্করণ।

শোষণকে উচ্ছেদের জন্যে এ সত্যকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য। এ উপলব্ধি যদি অন্তরে না আসে তাহলে ধর্মের দ্বারা সমগ্র সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ধর্মকে কীভাবে অসৎ উদ্দেশ্যসাধনের কাজে সাম্প্রদায়িকতাবাদী শোষকেরা ব্যবহার করছে তার সত্যকার চরিত্রও সার্থক-ভাবে উদ্ঘাটিত হবে না।

চার

ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা তার বর্তমান চরিত্র পরিগ্রহ করতে শুরু করে ঊনিশ শতকের সত্তরের দিকে, দেওবন্দ এবং আলীগড় মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তনের পর থেকে। এই প্রতিষ্ঠানদুটির উদ্দেশ্য এক ছিলো না।

দেওবন্দে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিলো তার মধ্যে আধুনিকতার পরিবর্তে ছিল গতানুগতিকতা। বহু শতাব্দী পূর্বে প্রবর্তিত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানের, বিশেষত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছিলো তার শিক্ষার কাঠামো। সেই অনুসারে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা, বিশেষত 'ফিকাহ্'-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো যথেষ্ট। ব্রিটিশ ভারতে যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিলো তার সাথে প্রকৃতপক্ষে দেওবন্দের কোন সম্পর্কই ছিলো না। এ সব দিক থেকে দেওবন্দ ছিলো পুরোপুরি একটি রক্ষণশীল ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তত্ত্বগতভাবে এবং ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম-চর্চাই ছিলো তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যের সাথে আলীগড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সামঞ্জস্য ছিলো না। আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠার সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রভৃতি যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী করে গঠন করতে চেয়েছিলেন। কাজেই ব্রিটিশ ভারতে উনিশ শতকে নতুন আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজনে যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেইজন্যেই এই শিক্ষায়তনে বিশুদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে বিজ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি গুরুত্বই ছিলো বেশী।

দেওবন্দ এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথমটি সৃষ্টি হয়েছিলো নতুন আর্থিক জীবনকে অনেকাংশে উপেক্ষা করে ধর্মীয় জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয়টি সৃষ্টি হয়েছিলো ধর্মীয় জীবনকে অনেকাংশে উপেক্ষা করে নতুন আর্থিক জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে। স্যার সৈয়দ আহমদের ব্যক্তিগত ধর্মনিষ্ঠা এবং ধর্মানুগত্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। তিনি মুসলমানদের ঐহিক জীবনে দুরবস্থার অবসান ঘটাতে যত্নবান হয়েছিলেন এবং তাঁর সমগ্র শিক্ষাচিন্তার সেটাই হলো মূলসূত্র।

স্যার সৈয়দ যখন আলীগড় কলেজের পত্তন করেছিলেন তখনও সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষের মাটিতে ভালোভাবে মূল এবং শাখা বিস্তার করেনি। তাঁর নিজের চিন্তাও তখন ছিলো বহুলাংশে অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু নিজের চিন্তার অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সৈয়দ আহমদ খান বেশীদিন আর রক্ষা করতে সক্ষম হলেন না। অচিরেই আঠারোশো আশীর দিকে আর্থিক ও রাজনৈতিক তাগিদে

তাঁর সে চিন্তা ভেঙ্গে পড়লো। তিনি দেখলেন যে, নব্যশিক্ষিত মুসলমানদের ব্যবসাবাণিজ্য চাকরীবাকরী ইত্যাদি ঐহিক স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম অনেকাংশে পরিণত হলো নব্যশিক্ষিত হিন্দুদের সাথে সংগ্রামে। আর্থিক জীবনে শুরু হলো হিন্দু-মুসলমানের ভাগবাঁটোয়ারার মারামারি এবং তার থেকেই জন্মলাভ করলো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ থাকার ফলে তাঁদের রাজনীতিও হলো ভিন্ন। সে প্রতিষ্ঠান থেকে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতো তারা ইংরেজের অফিস-আদালতে কোন চাকরী পেতো না। তাদের সে শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার ফলে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরীতে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভের আশাও করতো না। তারা চাকুরী পেতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অথবা উপার্জন করতো অন্যান্য ধর্মীয় কাজকর্মের দ্বারা। সেই হিসেবে হিন্দুদের সাথে তাদের আর্থিক জীবনে কোন প্রতিযোগিতা ছিলো না এবং প্রতিযোগিতার এই অভাব এবং ভাগবাঁটোয়ারার মারামারির বাইরে থাকার ফলে তাদের রাজনীতির চরিত্রও হলো স্বতন্ত্র। সাম্প্রদায়িকতা থেকে সে রাজনীতি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত থাকলো মোটামুটিভাবে মুক্ত।

আলীগড়ে যে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ মুসলমানেরা শুরু করলো সে শিক্ষাই বাংলাদেশ এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমানেরা ধীরে-ধীরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করতে শুরু করলো। তাদের এই নতুন শিক্ষার তাগিদ সম্পূর্ণভাবে এলো আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে গঠন করার তাগিদে। এই তাগিদের রাজনীতিই হলো সাম্প্রদায়িক এবং তার থেকেই হলো মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। যে প্রয়োজনে মুসলিম লীগের জন্ম সে প্রয়োজনের অভাবেই দেওবন্দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা। তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' এজন্যেই ছিলো অসাম্প্রদায়িক। এজন্যেই তার সাথে ছিলো ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ।

পাঁচ

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমেই মুসলিম সংস্কৃতি নামে কথিত সংস্কৃতি পরিণত হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারে। এ মুসলিম সংস্কৃতি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেওবন্দের মুসলিম সংস্কৃতি নয়। এ এমন এক সংস্কৃতি

যার সাথে ইসলামের তেমন কোন তত্ত্বগত যোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ সংস্কৃতি ইসলামে বিশ্বাসী বলে যারা দাবী করে তাদের হালুয়া রুটির যোগানদার।

মুসলিম সংস্কৃতির নাম করে মুসলমানদের যে সব সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয় সেগুলি অনেকক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে অথবা গায়ের জোরে সৃষ্ট। এদের অস্তিত্বও খুব বেশীদিনের নয়, এরা সাম্প্রদায়িকতার উত্থানযুগের প্রায় সমসাময়িক। অমুসলমানদের থেকে মুসলমানরা যে পৃথক এই কথা আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই বহুলাংশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিরই জন্ম। এজন্যে মুসলমানেরা যা করতো হিন্দুরা চাইতো তার বিপরীতটি করতে এবং হিন্দুরা যা করতো মুসলমানেরা তার উল্টোটি করে বসতো। যে কোন সমাজ ও দেশের সংস্কৃতি যে তার আর্থিক জীবনের দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উন্মেষ তারই এক অনস্বীকার্য উদাহরণ। এ কারণেই ইসলাম ধর্মের মধ্যে তথাকথিত মুসলিম সংস্কৃতির মূলসূত্র অনুসন্ধান করলে অতি সহজেই বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এ বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করতে হলে তার সন্ধান করতে হবে এদেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনভূমিতে।

মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতি চেতনার উন্মেষ হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত নয়। উপরন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাকৃতিক জগতের মতো মানুষ এবং তার সমাজ কতকগুলো অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অনুবর্তী। কিন্তু এ চিন্তাধারা নতুন না হলেও তার মধ্যে এই হিসেবে অনেকখানি নতুনত্ব আছে যে, আজ এ চিন্তাধারার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটছে তারা এজাতীয় চিন্তা করতে এতদিন অভ্যস্ত অথবা প্রস্তুত ছিলো না।

এ কথার অর্থ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, ধর্মগতভাবে মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানীরা, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা, ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশকে উচিতমতোভাবে কখনো স্বদেশ মনে করেননি। শ্রেণীস্বার্থের কারণে স্বদেশের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনে তাঁদের বরাবরই আপত্তি ছিলো এবং এই আপত্তি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ফলে অধিকতর ঘোরতর আকার ধারণ করে।

নিজের দেশকে স্বদেশ মনে না করার জন্যে মানুষের জীবনে যে দুর্যোগ স্বাভাবিক, মুসলমানরা সে দুর্যোগকে রোধ করতে পারেননি। পাক-ভারত উপমহাদেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের যে কারণে এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই অনেকখানি সেই কারণেই মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনও হয়েছে বহুলাংশে পঙ্গু ও সৃষ্টিহীন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এদেশের সাথে আত্মীয়তা বোধ করতে না পারার কারণ প্রধানত তিনটি। ধর্মগতভাবে তারা ছিল খ্রীষ্টান, তাদের ভাষা ছিলো ইংরেজী এবং তাদের দেহে প্রবাহিত ছিলো ইংরেজদের রক্ত। ইংরেজরা যেহেতু এদেশের শাসনকর্তা ছিলো এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ছিলো সেই শাসকদের ধর্মাবলম্বী, তাদের ভাষাভাষী এবং তাদের রক্তগত আত্মীয়, কাজেই তারা নিজেদেরকে মনে করতো ভারতবর্ষের লোকদের থেকে উচ্চশ্রেণীর ও

উচ্চবংশীয়। তাছাড়া ধর্মগত, ভাষাগত এবং রক্তগত ঐক্য এবং সম্পর্কের জন্যে তারা নিজেদেরকে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের মতো বিদেশী-শাসিত মনে না করে মনে করতো এদেশের শাসনকর্তা—রাজার জাতি। কাজেই ইংরেজী ছিলো তাদের ভাষা, ইংলণ্ডের ইতিহাস ছিলো তাদের জাতীয় ইতিহাস এবং অ্যাংলিকান চার্চ ছিলো তাদের জাতীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান।

বিদেশের সাথে এই কৃত্রিম আত্মীয়তা এবং স্বদেশের সাথে অনাত্মীয়তা-বোধের ফলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা সংস্কৃতি ও রাজনীতিগতভাবে এক শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থার সাথে এ সব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশে মুসলমানদের অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। সামন্তশ্রেণীর মুসলমানেরা মোগল রাজত্ব, এমনকি ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত, বাংলায় কথা না বলে ফারসী-উর্দুতে কথা বলতেন, নিজেদেরকে জাতিগতভাবে মনে করতেন আরব, ইরানী, তুর্কী, খুরাসানী অথবা সমরকন্দী এবং তাঁদের ধর্ম ছিলো ইসলাম। তাই বৈদেশিক ভাষা, রক্ত ও ধর্মের প্রভাব সামন্ততান্ত্রিক এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এদেশের মাটির সাথে মুসলমানদের আত্মিক যোগ স্থাপনকে করলো বাধাগ্রস্ত। দেশের মাটির সাথে এই সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হলো না, তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হলো বহুতরভাবে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেশকে বাতিল করে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা আকাশকুসুম রচনার মতো অবাস্তব ও বন্ধ্যা হতে বাধ্য।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মভেদ থাকলে তাদের সাংস্কৃতিক দৈন্য এতখানি উৎকট আকার ধারণ করতো না। কিন্তু ধর্মভেদ অন্যান্য ভেদাভেদের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করার ফলে অবস্থার অবনতি ঘটলো এবং সে অবনতিকে রোধ করা গেলো না। মুসলমান উচ্চশ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থরক্ষার জন্যে মোগল যুগোত্তর বাংলাদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের সাথে এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহের অন্ত রইলো না। এর ফলে বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চা করাও তাদের পক্ষে হলো অসম্ভব। এবং উনিশ শতকে ধর্মচর্চার ক্ষেত্র থেকে মুসলমানরা বাংলা

ভাষাকে বাদ দেওয়াই হয়ে দাঁড়ালো তাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক দৈন্যের অন্যতম মূল কারণ। হিন্দুদের সাথে এদিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা বিশেষভাবে তুলনীয়। মুসলমানদের থেকে ধর্মচর্চার তাড়না উনিশ শতকে হিন্দুদের মধ্যে কম ছিলো না। উপরন্তু এক হিসেবে বেশীই ছিলো। সে সময় হিন্দু সমাজে বহু ধর্মান্দোলনের উৎপত্তি এবং প্রসার হয়েছিলো। হিন্দুদের সংস্কৃতিচর্চা এই ধর্মান্দোলনের ফলে সমৃদ্ধ হলো কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হলো না। এর প্রধান কারণ মুসলমানদের চিন্তা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে আবর্তিত হলো আরব, ইরান, তুর্কীর চতুর্দিকে—অনেকখানি যেমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিলো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে।

মাত্র কিছুসংখ্যক ব্যতীত বাংলায় সমস্ত মুসলমানেরই পূর্বপুরুষরা এদেশের অধিবাসী এবং হিন্দু। কাজেই ধর্মীয় কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাংলাদেশকে পুরোপুরি স্বদেশ মনে না করার কোন কারণ তাঁদের ছিলো না। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা নিজেদের সুবিধামতো এক জাতিতত্ত্ব আবিষ্কার করে ক্রমাগত প্রচার করলেন যে, সৎবংশজাত মুসলমান মাত্রেরই পূর্বপুরুষ আরব, ইরান, তুর্কী থেকে আগত। এর ফলে মুসলমানরা নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হওয়ামাত্র সামাজিক মর্যাদালাভের জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বংশতালিকা রচনা করে সচেষ্ট হলেন নিজেদের বংশপরিচয় পরিবর্তনে। এ-ভাবেই মুসলমানরা আত্মিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন পরবাসী হয়ে।

মুসলমানদের এই মানসিকতার পরিবর্তনের শুরু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এবং এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনে; পূর্বে উর্দু না জানলে কোন মুসলমানই সৎবংশজাত বলে পরিচিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা এ কথা স্বীকার করলেও তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান 'মুসলমান বাঙালী'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো এবং সমস্ত সংস্কার বর্জন করে, উর্দুকে নিজের ভাষা হিসেবে বাতিল করে, বাংলাকে স্বীকার করলো মাতৃভাষা রূপে। এইভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের জীবনে সূত্রপাত হলো এক অভূতপূর্ব চেতনার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানদের মনে যদি কোন সত্যিকার বিপ্লব ঘটে থাকে তাহলে এই হলো তার সঠিক পরিচয়।

মুসলমানদের যে দৃষ্টি দেশের প্রতি এতকাল ছিল মমতাহীন, সেই দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হলো স্বদেশের প্রতি প্রেম ও মমতায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম তাই অনেকাংশে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম। যে মধ্যবিত্ত মুসলমান নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বিগ্ন হতো এর পর থেকে তার সে উদ্বেগের অবসান হতে শুরু হলো। বাঙালী পরিচয়ে সে আর লজ্জিত হলো না। যে চিত্ত ছিল পরবাসী, সে চিত্ত সচেষ্ট হলো স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। প্রতিকূল শক্তি এবং সংস্কার এ পরিবর্তনকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও ঘরে ফেরার এ সংগ্রাম রইলো অব্যাহত এবং তারা জয় করে চললো একের পর এক ভূমি—স্বীকৃত হলো রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য; স্বীকৃত হলো রবীন্দ্রনাথ এবং পয়লা বৈশাখ। এ স্বীকৃতির কোন-কোনটি এলো সরকারী ঘোষণাপত্রে কিন্তু তার সত্যিকার ক্ষেত্র হলো পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিস্তীর্ণ মানসলোক। এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে তাই মোটামুটিভাবে বলা চলে মুসলমান বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ

কোন্ ভাষা কতখানি সমৃদ্ধ সেটা বহুলাংশে নির্ভর করে ভাষার শব্দসম্ভারের ওপর। ভাষার শব্দসম্ভার আবার সেই ভাষাভাষী সমাজের জীবনব্যবস্থার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন ভাষা যদি শব্দসমৃদ্ধ হয় তাহলে এ কথা নিরাপদে বলা চলে যে, সেই ভাষায় যাঁরা কথা বলেন তাঁদের সমাজও সে তুলনায় সমৃদ্ধ এবং অগ্রসর। এজন্যেই যে কোন একটি পশ্চাদপদ সমাজের ভাষা সেই তুলনায় পশ্চাদপদ এবং উন্নত সমাজের ভাষা অনুরূপভাবে উন্নত হতে বাধ্য।

নৈতিকতার মতো ভাষাকেও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। ভাষার মাধ্যমে সমাজের চিত্রই প্রতিফলিত হয়। ভাষাকে তাই শুধু সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বললেই তার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। ভাষা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সব ভাষায় সবরকম শব্দের প্রচলন থাকে না। কারণ শব্দের প্রচলন নির্ভর করে সেগুলি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর। সে প্রয়োজন যদি বিশেষ কোন সমাজের মধ্যে অনুভূত না হয় তাহলে অনুরূপ কোন শব্দের আবির্ভাব তার ভাষার মধ্যে ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে মানুষের ঘরোয়া কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। কারো বাড়ীতে যদি টেলিফোন, গাড়ী, ফ্রিজ থাকে তাহলে এই শব্দগুলির ব্যবহার তার বাড়ীতে প্রায়ই হবে কিন্তু পল্লীগ্রামের এক সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর ঘরোয়া কথায় তাদের কোন ব্যবহার হবে না। কারণ গ্রামের সে বাড়ীতে এ সব জিনিসের ব্যবহার নেই। শহরের ধনী গৃহস্থ এবং পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের জীবনযাপন ও ব্যবহার্য দ্রব্যের পার্থক্যের ফলে তারা যে শব্দগুলি ব্যবহার করে তাদের মধ্যে অনেক তফাৎ হয়। বস্তুর ব্যবহারের ওপর এক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার একান্তভাবে নির্ভরশীল। বালিশ, টেবিল এবং টেলিফোন এই শব্দগুলি বাংলা ভাষায় একই সময়ে অথবা রাতারাতি আমদানী

হয়নি। এগুলির ব্যবহারের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান। তার কারণ বাঙালী সমাজে এই জিনিসগুলির প্রচলনের মধ্যেও ব্যবধান ঘটেছে বহু বছরের।

অনেক সময় আবার দেখা যায় এক-এক ভাষায় এমন বিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ থাকে যেগুলিকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করে তার অর্থ বোঝানো যায় না। অর্থাৎ সেই শব্দগুলোর কোন যথার্থ প্রতিশব্দ অন্য ভাষাটিতে নেই। যেমন বাংলা ভাষার 'ন্যাকামী' এবং 'অভিমান' এই দুই শব্দের তেমন কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। এ শব্দগুলি বস্তুনির্ভর হলে ঘরে অথবা সমাজে সেই জিনিসের আমদানীর ফলে হয়তো অনুরূপ শব্দ ব্যবহারও সম্ভব হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে শব্দদুটির সাথে বস্তুর কোন যোগাযোগ নেই। তাদের যোগ হচ্ছে বাঙালী সমাজের বিশিষ্ট মানসিকতা এবং মনের গঠনের সাথে। এ মনের গঠন যাদের নেই তাদের সমাজে 'ন্যাকামী' এবং 'অভিমানে'র যথার্থ প্রতিশব্দ না থাকাই স্বাভাবিক। শুধু উদু´ ইংরেজী বাংলার ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই এ-রকম কিছু শব্দ থাকে এবং সেই বিশেষ ভাবকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করার জন্যে প্রতিশব্দের সন্ধান না করে অনেক সময় এক ভাষার শব্দটিকে অন্য ভাষায় হুবহু গ্রহণ করা হয়।

নির্বিশেষ বা অ্যাব্‌সট্রাক্ট শব্দ সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। যে সমাজে যত উঁচু চিন্তা করতে মানুষ অভ্যস্ত সেই সমাজের ভাষায় নির্বিশেষ শব্দের সংখ্যা তত বেশী। এজন্যে সাঁওতালদের ভাষায় নির্বিশেষ শব্দের সংখ্যা হাতে গোনা সম্ভব হলেও ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান এবং রাশানে এ জাতীয় শব্দের সংখ্যাগণনা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু তাই নয়। এ সমস্ত ইওরোপীয় ভাষাগুলির শব্দসম্ভারও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। ল্যাটিনকে বাতিল করে ইওরোপে আধুনিক ভাষাগুলির উদ্ভব ও উন্নতি ইওরোপীয় জাতিগুলির জাগতিক উন্নতি এবং বুদ্ধিচর্চার ইতিহাসের থেকে অবিচ্ছিন্ন। বস্তুত এ উন্নতি না হলে তাদের ভাষার উন্নতি কোন প্রকারেই সম্ভব হতো না।

ভাষার কাঠামো সামাজিক কাঠামোর ওপর যেমন নির্ভরশীল তেমনি ভাষায় বিভিন্ন শব্দের আবির্ভাব ও প্রচলন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী ও ভাব ধারার প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল।

দুই

প্রত্যেক ভাষারই কতকগুলি মূল শব্দ থাকে। এ শব্দগুলি হতে অর্থের প্রকারভেদে অন্যান্য বহু সম্পর্কিত শব্দের সৃষ্টি হয়। শব্দসংখ্যার এই বৃদ্ধিকে মূল থেকে একটি বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি ও বিস্তারের সাথে তুলনা করা চলে। বৃক্ষ যেমন নীচের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে ভাষার মধ্যে এই-জাতীয় শব্দগুলিও তেমনি এক-একটি সমাজের জীবনভূমি থেকে রস সংগ্রহ করে বৃক্ষের মতোই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।

গতিশীল সমাজে উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক নতুন-নতুন শব্দ ও ভাবধারার সৃষ্টি হয়। এ সব ক্ষেত্রে যে নতুন শব্দগুলি সৃষ্টি ও প্রচলিত হয় সেগুলির সাথে ভাষার মূল শব্দগুলির কোন না কোনপ্রকার যোগসম্পর্ক থাকে। এজন্যে যে সমাজ যখন গতিশীল ও সৃষ্টিশীল হয় তখন তার ভাষার মধ্যেও নতুন-নতুন শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হতে থাকে।

তিন

ভাষার মধ্যে তাহলে বিদেশী শব্দের প্রচলন হয় কখন ও কীভাবে? সামাজিক উন্নতির সাথে-সাথে যদি শব্দসংখ্যার বৃদ্ধি হয় তাহলে সেগুলি সবই তো সেই ভাষার মূল শব্দগুলি থেকেই উদ্ভূত হতে পারে। কাজেই তার জন্য অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন কি?

বিদেশী ভাষা আমদানী হয় প্রধানত দুই কারণে। প্রথমত এক-একটি ভাষায় 'ন্যাকামী', 'অভিমান' ইত্যাদির মতো এমন কতকগুলি শব্দ থাকে যেগুলি অন্য ভাষায় অনুবাদসাপেক্ষ নয়। অনেক সময় আবার দার্শনিক ও চিন্তাবিদেরা এমন কতকগুলি বিশেষ শব্দ নিজ-নিজ ভাষায় ব্যবহার করেন যেগুলির প্রতিশব্দও অন্য ভাষায় তৈরী করা মুস্কিল এবং হয়তো-বা অসাধ্য। এ জাতীয় অসুবিধার জন্যে ভাষায় বিদেশী শব্দ আমদানী করা হয়। এবং এইধরনের শব্দ লেনদেন সমভাবে উন্নত ভাষাসমূহের মধ্যেও হয়ে থাকে। কিছুকাল ব্যবহারের ফলে এই বিদেশী শব্দগুলি এমনভাবে ভাষার অঙ্গীভূত হয় যে তাদেরকে বিদেশী বলে শব্দতাত্ত্বিকেরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সহজে চেনা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই প্রথম কারণে কোন ভাষার মধ্যেই খুব বেশী বিদেশী শব্দ

আমদানী হতে পারে না। বিপুল সংখ্যায় বিদেশী শব্দ আমদানী হয় সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন কারণে।

যে সমস্ত ভাষায় অধিকসংখ্যক বিদেশী শব্দের প্রচলন আছে সে ভাষাগুলির ইতিহাস দেখলে সহজেই চোখে পড়বে যে একই সময়ে সেগুলি ভাষার মধ্যে আসেনি। তারা আমদানী হয়েছে পর্যায়ক্রমে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। বাংলাতে অসংখ্য পর্তুগীজ, আরবী, তুর্কী, ফারসী, ইংরেজী এবং ফরাসী শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু বাংলা ভাষার মধ্যে এই শব্দগুলি একই সময়ে আমদানী হয়নি। বাঙালীরা তাদের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে ক্রমে-ক্রমে যেভাবে পর্তুগীজ, আরবী, তুর্কী, ইরানী, ফরাসী এবং ইংরেজী বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভিন্নদেশীয় শব্দগুলি ধীরে-ধীরে তাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

এটা ঘটলো কেন? এর উত্তর খুবই সোজা। সামাজিক উন্নতির মতো ভাষার উন্নতিও কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজ ও তার সংস্কৃতি একটি উন্নত সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলে অথবা তার প্রভাবভুক্ত হলে নিম্নতর সমাজ ও সংস্কৃতিটি অন্যটির থেকে বহু কিছু আমদানী এবং অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। নিম্নতর সমাজটি যদি উন্নত সমাজের রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের আওতায় পড়ে তাহলে এই সাংস্কৃতিক প্রভাব হয় আরও অনেক সুদূরপ্রসারী। সমগ্র সমাজ এইভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে ভাষাও স্বভাবতই সেই প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়।

এইভাবে দেখা যায় যে বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজ আধিপত্যের যুগে কিছু পর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। তারপর কয়েক শতাব্দীর তুর্কী পাঠান মোগলদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আধিপত্যের সময় অসংখ্য তুর্কী আরবী ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় অঙ্গীভূত হয়েছে। এখানে একটি জিনিস খুবই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জমিজমা, খাজনা, কোর্ট-কাছারীর সাথে সম্পর্কিত যত শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে সেগুলির প্রায় সবই ফারসী। এর কারণ মোগল আমলে নতুনভাবে জমি জরীপ, ভূমিরাজস্বের ব্যবস্থা এবং বিস্তৃত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন হলো। এবং এ সবের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলি স্বভাবতই হলো রাজভাষা ফারসী। ইংরেজ আমলেও ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ফারসীই

সরকারী ভাষা থাকার ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বেও জমিজমা রাজস্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত শব্দগুলি ফারসীই রয়ে গেলো। বেশ কয়েক শতক ধরে এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে এমনভাবে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলাতেও সেগুলিকে বাতিল করার কথা কেউ চিন্তা করে না। কিন্তু শুধু জমি ও রাজস্বের সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ ছাড়াও অন্যান্য বহু আরবী ফারসী শব্দ সেকালের সাধারণ সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলায় এসেছে। সেগুলিও বাংলা হয়ে গেছে এবং তাদেরকেও বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে না।

ইংরেজ রাজত্বে ফারসী শব্দের প্রচলন থাকলেও নতুন ফারসী শব্দ আমদানী কিন্তু বেশীদিন অব্যাহত থাকলো না এবং ১৮৩৭-এর পর প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। যে কারণে বাংলাতে ফারসী শব্দের আমদানী হয়েছিলো এবারে সেই কারণেই বাংলায় শুরু হলো নতুন ইংরেজী শব্দ আমদানীর। ব্রিটিশ বাণিজ্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষা এবং ভাবধারার প্রসার ও প্রচলনের সাথে-সাথে বহু শত ইংরেজী শব্দ বাংলা হয়ে গেলো।

বাংলা ভাষার উন্নতির যুগে বাংলাদেশ বিদেশী রাষ্ট্রীয় শাসন ও সংস্কৃতির প্রভাবভুক্ত হওয়ার ফলে বাংলাতে এত অধিকসংখ্যক বিদেশী শব্দের প্রচলন হয়েছে। অন্যথায় তা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

চার

বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার উন্নতির এক নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে কি বাংলা ভাষায় নতুন বিদেশী শব্দ আমদানী হবে? এবং সেটা হলে আমরা কোন ভাষার দ্বারস্থ হবো, আরবী ফারসীর, না জর্মান ইংরেজীর, না অন্য-কিছুর?

এক্ষেত্রেও ভাষার উন্নতি যে নিয়মতন্ত্রের অধীন সেই নিয়মসমূহের দ্বারাই বিদেশী শব্দের প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হবে। পূর্বের কথার পুনরুক্তি করে এক্ষেত্রে আবার বলা চলে যে উন্নত ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ভাষায় শব্দ আমদানী হয়। উন্নত ভাষাটি যে সমাজের সেই সমাজের রাষ্ট্রীয় শাসন এই নিয়ন্ত্রণে খুব বেশী সহায়তা করে। অন্যপক্ষে অনুন্নত ভাষা থেকে শব্দ আমদানী করার কোন প্রয়োজন উন্নত ভাষায় থাকে না। তবে এই দুই ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে অনেক সময় উন্নত ভাষার মধ্যে কিছুসংখ্যক

শব্দ অনুন্নত ভাষা থেকে আমদানী হতে পারে। যেমন 'ডাকোয়েট', 'জগন্নাট', 'ফকীর', 'ভারান্দা' ইত্যাদি অল্পসংখ্যক ভারতীয় শব্দ ইংরেজীতে প্রচলিত হয়েছে। ইংরেজ কিন্তু বেশী ভারতীয় শব্দ নিজেদের ভাষায় আমদানী করার কথা কখনো চিন্তা করেনি এবং তার কোন প্রয়োজনও তাদের হয়নি।

আমরা আমাদের ভাষার ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায়ে তাহলে কোন্ ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করবো? বাংলাতে নতুন বিদেশী শব্দের ব্যবহার সাবধানে ও সংযতভাবে করা দরকার। ভাষার সত্যিকার উন্নতিসাধন করতে হলে এমন শব্দ ভাষায় আমদানী করা প্রয়োজন যেগুলি আমাদের শিক্ষা, গবেষণা, আর্থিক ও সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের গঠনকার্যে সহায়ক হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে যদি আমাদেরকে বিদেশী শব্দ একান্ত নিতেই হয় তাহলে প্রয়োজনমতো ইওরোপীয় ভাষাগুলিরই আশ্রয় নিতে হবে। কারণ বর্তমান জগতে ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান, রাশান ইত্যাদি ভাষাতেই সর্বোচ্চ শিক্ষা এবং জ্ঞানের চর্চা আছে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে আরবী-ফারসী শব্দ নতুন করে আমাদের ভাষায় আমদানী এবং চালু করার প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং মূঢ়তাপ্রসূত। আরব ও ইরানী সমাজ বর্তমানে সাংস্কৃতিক উন্নতির যে পর্যায়ে আছে সেটা বাঙালী সংস্কৃতির থেকে কোন হিসেবেই উন্নত নয়। এবং আরব-ইরানীদের কোন রাষ্ট্রীয় আধিপত্যও আমাদের ওপর নেই। কাজেই আমাদের উন্নতির বর্তমান পর্যায়ে তাদের ভাষা থেকে নতুন শব্দ আমদানী করা অথবা যে সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দ যথার্থভাবে বাংলা ভাষায় অঙ্গীভূত না হয়ে এখনো কিছু-কিছু আধাবাঙালীদের বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে গায়ের জোরে চালু করতে যাওয়া অন্ধ উন্মত্ততারই নামান্তর। যে সব আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা হয়ে গেছে সেগুলি আজ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সেগুলি আমাদের ভাষায় প্রচলিত আছে এবং থাকবে। কাজেই বর্তমানে আরবী ফারসী শব্দ নতুন করে চালু করার প্রচেষ্টার সাথে আমাদের জীবনের কোন যোগ নেই। এ প্রচেষ্টা যারা করবে তারা বাংলা ভাষার ইতিহাসে শুধু রক্ষণশীল নয়, প্রতি-ক্রিয়াশীল নামেই পরিচিত হবে। কেউ যদি এ জাতীয় শব্দ বোঝাই করে কাব্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা করে তাহলে সে কাব্য হবে ব্যক্তিগত অহমিকা এবং কুসংস্কারের মহাকাব্য। আমাদের জীবনে তার কোন স্থান নেই। কারণ এদেশেও এ জাতীয় 'মহাকাব্যের যুগ শেষ হইয়াছে'।

পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে বিদেশী প্রভাব

ইদানিং প্রায়ই দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকপত্র, সাহিত্যিক ভাষণ এবং মেঠো বক্তৃতায় এক শ্রেণীর লোক সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কতকগুলি কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। তাঁদের এ সব কথা বলার কায়দা অনেকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করার মতো। এবং তাঁদের প্রধান বক্তব্য হলো দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমাদের জীবন প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। এ তো ভালো কথা। কিন্তু সংস্কৃতির এইসব মুরুব্বীদের আলোচনা, সমালোচনা এবং গঞ্জনাজ্ঞাপক উক্তি থেকে প্রথমত মনে হয় তাঁরা ছাড়া এদেশে অন্য সকলে যাঁরা সাহিত্য সঙ্গীত সংস্কৃতি চর্চা করছেন তাঁরা মঙ্গলগ্রহ এবং চন্দ্রলোকের জীবনচিত্রণে ব্যাপৃত। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যকে আরও কিছুটা অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে তাঁরা মঙ্গলগ্রহ অথবা চন্দ্রলোকের কথা বলছেন না। তাঁরা বলতে চান যে বিদেশী সংস্কৃতির কোন প্রভাব আমাদের জীবনে পড়তে দেওয়া হবে না এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে বিদেশী প্রভাবকে বর্জন ও প্রতিহত করতে হবে।

অনেকের কাছে এ জাতীয় কথা মনে হবে বিস্ময়কর। কারণ তাঁরা জানেন যে সংস্কৃতির সাথে জীবনযাত্রার যোগ স্বভাবতই নিবিড়, গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন। কাজেই জীবনে যদি গতি ও চাঞ্চল্য থাকে, আমাদের দেশের জীবন যদি অন্যান্য দেশের সমাজ ও জীবনের সাথে বিভিন্ন সূত্রে যুক্ত হয় তাহলে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সেই যোগাযোগ ও প্রভাব চিহ্নিত হতে বাধ্য। সংস্কৃতিক্ষেত্রে এ প্রভাবকে রোধ করতে হলে তার একমাত্র উপায় আমাদের জীবনের সাথে অন্য সমাজ এবং অন্য দেশের যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করা। অর্থাৎ সংস্কৃতিতে বিদেশী প্রভাব বন্ধ করতে হলে আমাদের দেশে বিদেশী চাল গম আমদানী বন্ধ করতে হবে; বিদেশী গাড়ী, বইপত্র, সিনেমা, প্রসাধন সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে হতে হবে নিষিদ্ধ। এ ছাড়া বন্ধ করতে হবে বিদেশীদের এদেশে আগমন এবং এদেশীয় লোকদের বিদেশ যাত্রা। এক

কথায় আমাদের দেশটিকে পরিণত করতে হবে এমন একটি সামাজিক দ্বীপে যেখানে বিদেশী কাকপক্ষীর আকাশচারণও হবে অসম্ভব।

কিন্তু উপরোক্ত মুরুব্বীরা কি এই পথে অগ্রসর হচ্ছেন, না হতে চান? এদিকে একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে তাঁরা এ পথে অগ্রসর হচ্ছেন না এবং হতে চান তার কোন সঙ্কেতও দেখা যাচ্ছে না। প্রথমত এ কাজ সম্ভব নয় এজন্যে যে হাজার ইচ্ছে করলেও আজকের দুনিয়ায় কোন সমাজের জীবনই অন্যান্য সমাজের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অথবা যোগাযোগহীন হতে পারে না। দ্বিতীয়ত বিদেশী সামগ্রী ছাড়া মুরুব্বীদের নিজেদের জীবনযাত্রাই এখন আর সম্ভব নয়। বিদেশী গাড়ী, সিনেমা, প্রসাধন উপকরণ, কাপড়, ফ্রিজ, রেডিও, টেলিভিশন তাঁদের দরকার। এ ছাড়া তাঁদের অনেকে বিদেশের 'নিষিদ্ধ' পানীয় সেবনে এবং সস্তা মার্কিন ম্যাগাজিনের চিত্রদর্শনে আসক্ত। কাজেই এ সব জিনিসের আমদানী বন্ধ করার কথা বলতে তাঁরা নারাজ। কিন্তু এ কাজ করতে রাজী না হলে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিরোধ করা যাবে কেমন করে?

এবার দেখা যাবে যে আসলে তাঁদের মনে এ জাতীয় বিদেশী প্রভাব বন্ধ করার প্রশ্ন নেই। ধর্মশাস্ত্রে যাই থাক স্কটল্যাণ্ডীয় সোমরস, মার্কিনী সিনেমা এবং মার্কিন ম্যাগাজিনের ইন্দ্রিয়হর্ষক চিত্র তাঁদের এতই মজ্জাগত যে, সেগুলিকে বিদেশী বা ধর্মবিরোধী বলে তাঁদের মনে হয় না। কাজেই এদেশীয় লোকেরা মার্কিনী কায়দায় ঘোরাফেরা এবং জীবনযাপন করলেও কোন ক্ষতি নেই। তাতে দেশীয় সংস্কৃতি বিপন্ন হয় না।

আমাদের সংস্কৃতি তাহলে বিপন্ন হয় কিসে? এর উত্তরে তাঁরা বলবেন, জ্যাজ ও চাচাচার বদলে কীর্তন, অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের গানে; শার্ট-প্যান্টের পরিবর্তে ধুতীচাদরে; লিপষ্টিকের বদলে কপালের টিপে; 'লাইফে'র নগ্নচিত্রের পরিবর্তে অবনী ঠাকুর যামিনী রায়ের ছবিতে; এবং ফ্রাঙ্কলিন প্রকাশনীর 'সাহিত্য সম্পদে'র পরিবর্তে উনিশ শতকের বাংলাদেশের সাহিত্যে।

উপরের অঙ্কিত বিপদের চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে বিদেশী প্রভাব বলতে এইসব মুরুব্বীরা আসলে যে প্রভাবের কথা বলতে চান সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের আগে পর্যন্ত সমগ্র বাঙালী সমাজের সংস্কৃতি এবং তার প্রায় দেড়শো বছরের সাহিত্য-

সাধনার প্রভাব। এই 'বিদেশী' প্রভাব থেকেই তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চান। কারণ তার সাথে নিজেদের যোগকে ছিন্ন করতে না পারলে আমাদের নাকি পরিত্রাণ নেই। মুরুব্বীদের মতানুসারে উপরোল্লিখিত 'বিদেশী' প্রভাব বর্জন করতে হবে তার কারণ সেই প্রভাব 'ইসলাম', 'পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুন' এবং 'পাকিস্তান' বিরোধী।

যে সকল বিদেশী প্রভাব আজ আমাদের সমাজে সবথেকে বেশী কার্যকরী এবং যেগুলিকে প্রতিরোধ অথবা বর্জন করার কোন সঙ্কল্প এবং প্রস্তুতি তো নেইই উপরন্তু যাদের অবাধ রাজত্বকে এদেশে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে সেগুলির চরিত্র বিচার করলেই ইসলাম এবং পাকিস্তানের প্রতি মুরুব্বীদের আনুগত্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

মার্কিনী এবং অন্যান্য পশ্চিমদেশীয় সিনেমা শিল্পের অনুকরণে এদেশে যে সিনেমা শিল্প গড়ে উঠছে তার সাথে ইসলামের এবং আমাদের সংস্কৃতির যোগ কোথায়? এ সব ছায়াছবির মাধ্যমে যে উগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুৎসিত মনোবৃত্তির সৃষ্টি ও প্রসার হচ্ছে তার সাথে ইসলামের তত্ত্বগত সম্পর্ক কি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জীবনচিত্র তার মধ্যে আজ কিভাবে প্রতিফলিত? এর মাধ্যমে যা প্রতিফলিত হচ্ছে সেটিকে আমাদের সমাজের চিত্র হিসাবে বর্ণনা করার থেকে অপমানকর আমাদের পক্ষে আর কী হতে পারে? কিন্তু তবু এ জাতীয় সিনেমা শিল্পই এখন অপ্রতিহতভাবে আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করছে এবং মুরুব্বীদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই তা সম্ভব হচ্ছে। কাজেই মুখে তাঁরা যাই বলুন নিজেদের কর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁরা ইসলাম এবং এদেশীয় সংস্কৃতির বিরোধিতাই করেছেন। দূষিত মার্কিনী প্রভাবের রাজত্ব কায়েম করে তাঁরা এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করছেন।

কেবলমাত্র মার্কিনী সিনেমা আমাদের দেশে আমদানী করে এবং তার প্রভাবের আওতায় এদেশের সিনেমা শিল্প গঠনে সাহায্য করেই তাঁরা ক্ষান্ত নন। অজস্র বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তানে যে মার্কিন সাময়িকপত্র-গুলি আমদানী হচ্ছে তাদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির বদলে উৎকট নৈতিক নৈরাজ্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ জাতীয় সাময়িকপত্র আমাদের দেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশকেই যে রুদ্ধ করছে তাই নয় এগুলির দ্বারা আমাদের সমগ্র নৈতিক জীবনই আজ বিপন্ন। এবং মুরুব্বীদের সক্রিয়

সমর্থনেই এই 'মহৎ' কার্য সম্পন্ন হচ্ছে।

মার্কিন তথ্য সরবরাহ বিভাগ ও ফ্রাঙ্কলিন প্রকাশনীর উদ্যোগে যে বই-গুলিকে আজ এদেশে সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা বলে পরিচিত করার চেষ্টা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে উচ্চমানের সাহিত্য ও সত্যিকার শিক্ষাবিষয়ক বইপত্র নিতান্তই নগণ্য। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে মার্কিনদেশীয় ভালো নাটক, নভেল ও অন্যান্য লেখা তারা বিশেষ প্রকাশ করে না। যে বিকৃত সাংস্কৃতিক প্রচার-সাহিত্য তারা প্রকাশ করে সেগুলি আমাদের 'নিজস্ব' সংস্কৃতির বিকাশে কোন্ অর্থে সহায়ক? যদি সহায়ক না হয় তা হলে তাদেরকে এদেশে প্রকাশনার অনুমতি ও সুযোগ দেওয়া হয় কেন? মুরুব্বীরা কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলতে নারাজ।

এ জাতীয় বিদেশী প্রভাবের উদাহরণ অনেক দেওয়া চলে। কিন্তু ওপরে যে কটির উল্লেখ করা হলো তার দ্বারাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'স্বদেশের সংস্কৃতি', 'দেশের জীবনচিত্র', 'ইসলাম', 'পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুন' ইত্যাদির জন্যে মুরুব্বীদের জীবন উৎসর্গীকৃত এই ঘোষণা বারবার উচ্চারিত হলেও এগুলির মূলোচ্ছেদ যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন বিক্ষোভ নেই। বস্তুত-পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বিদেশী প্রভাবের বন্যায় তাঁরা নিজেরাই অনেক ভেসে চলেছেন।

এবার তাহলে দেখা যাক লিপস্টিকে যদি মুসলমানদের জাত বজায় থাকে তাহলে কপালে টিপ দিলে তাদের জাত যাবে কেন? পশ্চিমী চিত্রশিল্পীদের ছবি দেওয়ালে টাঙালে যদি আমাদের সংস্কৃতি বিনষ্ট না হয় তা হলে অবনী ঠাকুর, যামিনী রায়ের ছবিতে তা বিনষ্ট হবে কেন? ফ্রাঙ্কলিন-মার্কা মার্কিনী সাহিত্য আমদানী করলে পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা যদি বিপন্ন না হয় তা হলে বিশ্বভারতীর বইপত্রে সেটা হবে কেন? এদেশের উচ্চশ্রেণীর ক্লাবে হোটেলে পশ্চিমী নাচ যদি স্বদেশী সংস্কৃতির পক্ষে বিপজ্জনক না হয় তাহলে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের দ্বারা সে বিপদপাত হবে কী কারণে?

কপালের টিপের থেকে লিপস্টিক, অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের থেকে ভ্যান গগ, প্যল গঁগা, বিশ্বভারতীর থেকে ফ্রাঙ্কলিন, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের থেকে ওয়াল্‌জ চাচাচা কোন্ অর্থে 'ইসলাম', 'মুসলিম সংস্কৃতি' অথবা 'পাক বাংলা'র কালচারের নিকটতর আত্মীয়? কার সাথে কার আত্মীয়তা বেশী এ কথা

মুরুব্বীদেরও অজানা নেই। কিন্তু সেটা জানা থাকলে এক্ষেত্রে তাঁদের আসল বক্তব্য কী এবং তাঁদের সত্যিকার উদ্বেগটি কোথায় ?

পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিক্ষেত্রে বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছে তার ফলে এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ আজ বিপন্ন। তাঁরা ধর্মের ব্যবসা করেন এবং সাম্প্রদায়িকতা তাঁদের এই ব্যবসার প্রধান মূলধন। এই ব্যবসায়ীদেরকে এমন অনেকেই আবার সাহায্য ও সমর্থন করেন যাঁরা নিজেরা ধর্মের ব্যবসা না করলেও নানা প্রকার ধর্মীয় সংস্কারের প্রতাপে সঙ্কুচিত। বিদেশী বলতে তাঁরা সকলেই সত্য অর্থে বৈদেশিক কোন কিছু বোঝেন না। তাঁদের মতে বিদেশীয় অর্থ হিন্দু। এদেশের লক্ষ-লক্ষ হিন্দুর প্রতি এই মনোভাবে সগৌরবে প্রকাশ করে তাঁরা নিজেরাই ভয়াবহভাবে পাকিস্তানের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতিকে বিপন্ন করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই সমগ্র বাঙলার হাজার বছরের বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে তাঁরা আজ পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতি এবং 'বিদেশী' বলে চালাতে আগ্রহশীল। এজন্যেই মাইকেলের সাহিত্যকেও 'বিদেশী' আখ্যা দিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অথবা লজ্জা নেই। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে বিদেশী প্রভাব প্রতিরোধ করার অর্থ যা কিছুর সাথে বাংলাদেশের হিন্দুদের সম্পর্ক তাকে বর্জন ও প্রতিরোধ করা। এই হলো তাঁদের সতি্যকার বক্তব্য।

কিন্তু কোন্ উদ্বেগের থেকে এই বক্তব্যের উদ্ভব ? এর উত্তরও অতিশয় সহজ। অন্যান্য কথা বাদ দিয়ে শুধু সংস্কৃতির কথা ধরলেও দেখা যাবে যে সংস্কৃতিক্ষেত্রে হিন্দু বিতাড়ন না হলে মুরুব্বীদের নিজেদের ব্যবসা এবং রাজ্যবিস্তার ঠিকমতোভাবে সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া জোনাকীর রাজত্ব কায়েম করতে হলে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তাড়াতেই হবে। কাজেই তারা আজ বাংলা-দেশের উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধনাকে 'বিদেশী' আখ্যা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়ন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যাঁরা তাঁদের সাথে এ ব্যাপারে একমত নন তাঁরা নাকি পাকিস্তান-বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী !

মুরুব্বীদের ব্যবসাবুদ্ধি অস্বীকার করবে কে ?

নজরুল ইসলাম অহিফেন

নজরুল ইসলাম সাহিত্যিক হিসাবে প্রগতিশীল হলেও কোন নির্দিষ্ট জীবন-দর্শনের গণ্ডীর মধ্যে তিনি ধরা দেননি। অর্থাৎ তিনি তাঁর চিন্তার মধ্যে তেমন কোন শৃঙ্খলা কোনদিন আনতে পারেননি অথবা তার চেষ্টাও করেননি। কাজেই তাঁর সাহিত্যের একটা প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও এ কথা বলা চলে না যে তিনি নির্ভেজাল সাম্যবাদের কবি অথবা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী। কেউ সে কথা বললে সত্যের অপলাপই হবে। তিনি সাম্যবাদের ওপর লিখেছেন, নিজে সাংবাদিকতার মাধ্যমে কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, মুজফফর আহমদ প্রমুখ সাম্যবাদীদের সহকর্মী হিসেবে অনেক সময় কাজ করেছেন কিন্তু তবু তাঁদের সকলের সাথে নজরুলের একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবধান বজায় থেকেছে। তাঁরা কোনদিনই তাঁকে ষোল আনা পেতে পারেননি। নজরুলের ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতা এবং বৈশিষ্ট্য সেজন্যে অনেকখানি দায়ী। শুধু মুজফফর আহমদের মতো সাম্যবাদীরা কেন নজরুল-চরিত্রের অনেক দুর্বলতা লক্ষ করে মোহিতলাল পর্যন্ত তাঁর অভ্যাস সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সে প্রচেষ্টা ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ ও বিবেচনাহীন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বলা চলে যে স্বভাবগতভাবে নজরুল ইসলাম একজন কবি এবং সেই হিসেবে দেশের মানুষের সাথে তিনি বোধ করতেন গভীর একাত্মতা। এই একাত্মতাবোধ থেকেই তার স্বদেশপ্রেম ও প্রগতিশীলতার উৎপত্তি।

শুধু তাঁর স্বাদেশিকতা ও প্রগতিশীলতাই নয় তাঁর সমগ্র সাহিত্য ও কর্মজীবনই এই বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরই তাড়নায় একদিকে তিনি যেমন অত্যাচার শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন অন্যদিকে তেমনি তাঁর লেখনী সৃষ্টি করেছে এক ধর্মসাহিত্য—যে সাহিত্যের হিন্দু-মুসলমান নেই, যা হিন্দুর যতখানি মুসলমানেরও ঠিক ততখানি। এদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে যে নজরুল ইসলামই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি বাঙালী সংস্কৃতিকে

আত্মসাৎ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাথে তাঁর প্রতিভার তারতম্য থাকলেও এ বিষয়ে নজরুল ইসলাম অতুলনীয়, অনন্য-সাধারণ। বাঙালী হিসাবে তাই তাঁর ধর্ম ছিলো না, থাকলে অতখানি পুরো-পুরিভাবে বাঙালী হতে সক্ষম হতেন না। তবু কেউ যদি জোর করে কোন ধর্ম তাঁর ঘাড়ে চাপাতে চায়, তা হলে বলতে হবে যে আসলে তিনি দ্বিধর্মী—তিনি হিন্দু-মুসলমান। অর্থাৎ তিনি শুধু হিন্দু অথবা শুধু মুসলমান নন—তাঁর মধ্যে এ দুইয়ের অবাধ সমন্বয়। এই সমন্বয়ের মধ্যেই নজরুলের বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যেই তাঁর বাঙালীত্বের সম্পূর্ণতা। এজন্যেই তিনি অবিভাজ্য!

দুই

নজরুল ইসলামের সাহিত্যকীর্তির সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁদের অজানা নেই যে তিনি একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী সাহিত্যেরও প্রতিনিধি। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় সাহিত্যের যৌথ ধারা তাঁর মধ্যে প্রবাহিত। এ ধারার কোন একটি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা নজরুল ইসলামকে, তাঁর স্বকীয়তাকে অস্বীকার করারই প্রচেষ্টা। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের কথা স্মরণ করে কেউ তাঁকে হিন্দু আখ্যা দিলে তিনি যেমন ভুল করবেন, তেমনি তাঁর নাত্ ও হাম্‌দের কথা স্মরণ করে কেউ তাঁকে মুসলমান আখ্যা দিলেও সেই একই ভুল করা হবে।

নজরুল ইসলামের এই দ্বিধর্মিতার যথার্থ চরিত্র উপলব্ধি করতে হলে ধর্মপ্রেরণার মধ্যে তার সন্ধান করলে চলবে না। তার সন্ধান করতে হবে জন-সাধারণের সাথে তাঁর একাত্মতা এবং যোগ সাধনার মধ্যে। তাঁর জীবনী এবং রচনাসমূহের সতর্ক পর্যালোচনা করলে তাই দেখা যাবে যে ধার্মিকতা বলতে চলতি অর্থে যা বোঝায় তার সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই কখনো থাকে-নি। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছিলেন কারণ এই ধর্মসাহিত্যের মাধ্যমেই তিনি যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন জন-গণের সাথে, এর মাধ্যমেই তিনি অনেক সময় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন অত্যাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। তাঁর সমস্ত ধর্মবিষয়ক লেখা সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য না হলেও মোটামুটিভাবে তা সত্য। তার কারণ

ধর্মবিষয়ে তিনি যতই লিখুন তাঁর প্রতিভার প্রধান প্রবণতা ছিলো গণসাহিত্যের দিকে।

তিন

নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সাধনার মধ্যে তাঁর প্রতিভা লাভ করেছিলো বিশাল বৈচিত্র্য। এখানেও তিনি একদিকে যেমন খড়্গ ধারণ করেছেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্যদিকে তেমনি রচনা করেছেন ধর্ম এবং প্রকৃতিবিষয়ক সঙ্গীত। কাজেই কবি হিসেবে তাঁর মুখ্য অথবা গৌণ প্রবণতা যেদিকেই থাক তিনি একাধারে গণসাহিত্য এবং ধর্মীয় ও প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার স্রষ্টা।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে তিনি যে সমস্ত গান ও কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে অসংখ্য হলো ফরমায়েসী। এর অধিকাংশই আবার রেকর্ড কোম্পানী হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসের ফরমাস অনুযায়ী লেখা। অনেক সময় দেখা গেছে যে তাদের স্টুডিওতে বসেই তিনি একের পর এক বহু গান লিখে সঙ্গে-সঙ্গে সুর যোজনা করে রেকর্ড করে চলেছেন। এদের মধ্যে ধর্মীয় সঙ্গীতের সংখ্যা নগণ্য নয়। এবং সেগুলি নজরুলকে লিখতে হয়েছিলো ব্যবসাদারের তাগিদে, অর্থ উপার্জনের তাড়নায়।

চার

নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্চার তেমন কোন স্থান ছিলো না। ধর্মবিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টি সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে বলা চলে যে গণসাহিত্য সৃষ্টির সাথে-সাথে জনসাধারণকে রাজনীতিগতভাবে সাম্রাজ্য-বাদী শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনেকখানি সক্রিয়। অন্য সবকিছু বাদ দিলেও তাঁর সাংবাদিক জীবনই এর সবথেকে বড়ো উদাহরণ।

নজরুল ইসলাম ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশের মুসলমানরা কোনদিনই তাঁকে ইসলামের খাদেম অথবা মুসলিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে স্বীকার করেননি। এজন্যে কর্মজীবনে তিনি কোনদিনই বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে তেমন ভালভাবে ঠাঁই পাননি। বরং বিপুল অধিকাংশ স্বধর্মীদের দ্বারা তিনি বরাবর ধিকৃকৃতই হয়েছিলেন তাঁর স্বাদেশিকতা, প্রগতি-

শীলতা এবং 'হিন্দু প্রীতির' জন্যে। এ ঘটনা কারো অবিদিত নয় এবং এর তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শ্যামাসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন সত্য কিন্তু সে কারণে তাঁকে কালী-ভক্ত হিন্দু সাধক মনে করার কোন কারণ থাকেনি এবং হিন্দুরা কোনদিন নজরুল চরিত্রের সে ব্যাখ্যাও দিতে চেষ্টা করেননি। কাজেই নজরুল ইসলামের সমগ্র সাহিত্য ও কর্মজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে তাঁকে এদেশের গণসাহিত্যের একজন প্রধান দিকপাল হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিলো। সেই হিসেবে তিনি ছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক জাতীয়তাবাদী যোদ্ধা। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অর্থও তাই তাঁর কাছে ছিলো এদেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন। তাঁর এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা অথবা ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন স্থান ছিলো না। মুসলিম লীগ এবং তার আদর্শ থেকে তিনি নিজেকে তাই তফাৎ রেখেছিলেন সতর্কভাবে। নজরুল সাহিত্যের অন্যান্য অনেক গৌণ পরিচয় থাকলেও এই ছিলো তাঁর আদর্শিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মুখ্য পরিচয় এবং এ পরিচয়কে বাতিল করার মতো কোন নতুন তথ্য-প্রমাণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

পাঁচ

নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার উদ্দেশ্য আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি জনসাধারণ এবং সংস্কৃতিকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পূর্ব পাকিস্তানে আজ নজরুল সাহিত্য-চর্চার হিড়িক পড়েছে। এতে সকলেরই উৎসাহ বোধ করার কথা। কিন্তু নজরুল সাহিত্য চর্চার নামে যে কীর্তিকলাপ এখন শুরু হয়েছে তাতে উৎসাহের থেকে আশঙ্কাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ এই সাহিত্যচর্চার নামে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী গণসাহিত্যের প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম আজ পরিণত হতে চলেছেন সাম্প্রদায়িক সাহিত্য এবং রাজনীতির হাতিয়ারে। সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের হাতে পড়ে নজরুল আজ ইসলাম ধর্মের সাধক, মুসলিম সংস্কৃতির এবং সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অন্যতম প্রতিনিধি!

তথাকথিত নজরুল ভক্তদের নজরুল প্রীতি এবং নজরুল সাহিত্যচর্চার এই

দিকটির প্রতি লক্ষ রাখলেই দেখা যাবে যে তাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিরোধী আন্দোলন আজ নজরুলকেও গ্রাস করতে উদ্যত। বাংলার বিরুদ্ধে তাদের উদ্যম যতই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ততই তারগতি হচ্ছে বিচিত্রমুখী। পূর্বে তাদের চেষ্টা ছিলো বাংলা সাহিত্যের এলাকা থেকে অমুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করে এক মুসলিম সাহিত্য সৃষ্টি করা। এই প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেই কথা প্রসঙ্গে একদিন খালেদ চৌধুরী বলেছিলেন, 'যে সাহিত্য মুসলমানদের দ্বারা গঠিত সেই সাহিত্যকে মুসলিম সাহিত্য বলে।'

বাংলা সাহিত্যকে এই সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রেখে তার বিকাশ ও বৃদ্ধিকে রোধ করার চেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানে নতুন নয়। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যতই অগ্রসর হয়েছে ততই সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নতুন-নতুন উপায় ও পথ নির্ধারণ এবং অন্বেষণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কোন পর্যায়েই তাঁদের সাফল্য আসেনি, কিন্তু তবু উদ্যম তাঁদের অব্যাহত আছে।

ছয়

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই নজরুল সাহিত্য চর্চা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তা সর্বতোভাবে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত। তাঁদের সংস্কৃতিকর্মের এই দিকটিকে জনসাধারণের সামনে ভালোভাবে উদ্ঘাটিত করার প্রয়োজন সেজন্যেই আজ অপরিহার্য।

মিথ্যার ব্যবসা অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রয়োজনের গুরুত্ব শুধু আজকেই উপলব্ধ বা আবিষ্কৃত হয়নি। এ উপলব্ধি এবং আবিষ্কার শোষণের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। শক্তি প্রয়োগ ক্ষমতা শোষণের জন্যে অপরিহার্য হলেও শুধু তার দ্বারাই সংখ্যালঘু কখনো শান্তিপূর্ণভাবে সংখ্যাগুরুকে শোষণ করতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন হয় তাদেরকে, তাদের চিন্তাভাবনা অনুভূতিকে প্রচারণার দ্বারা এমনভাবে গঠন করা যাতে তারা শোষণকে শোষণ বলে নির্ণয় করতে বা চিনতে না পারে। কেবলমাত্র এখানেই শেষ নয়। তারা যেন শোষণের মধ্যে নিজেদের মঙ্গলই দেখতে পায়। এ কার্য সাধন করতে হলে সত্যকে পরিহার এবং মিথ্যাকে আশ্রয় করা ব্যতীত উপায় নেই। শোষণের সাথে মিথ্যার তাই সহ-অবস্থান।

সাত

শোষণের হাতিয়ার এই মিথ্যাকেই লেনিন আখ্যা দিয়েছিলেন অহিফেন। অহিফেন সেবনের দ্বারা মানুষের সুস্থ চেতনা যেমন আক্রান্ত হয়, অনুপাতজ্ঞান ও কার্যক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং পৃথিবীর যাবতীয় সব-কিছুকে মনে হয় অবাস্তব, ঠিক তেমনি এই মিথ্যারূপী অহিফেনও মানুষের চিন্তাশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষমতাকে বিলুপ্ত করে তাকে পরিণত করে অন্যের দাসানুদাসে। পৃথিবীতে এ জাতীয় অহিফেনের সংখ্যার শেষ নেই। প্রয়োজনের তাগিদে তারা আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন শেষে তাদের দেখা মেলে না। নতুন প্রয়োজনের তাগিদে আবার আবিষ্কৃত হয় নতুন মিথ্যা, অহিফেনের নতুন সংস্করণ।

আমাদের দেশেও শোষণ আছে এবং তার সাথে আছে মিথ্যার বেসাতি, অহিফেনের বিস্তৃত ব্যবস্থা। অশিক্ষিত জনসাধারণ, এমনকি শিক্ষিত লোকদেরকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করার জন্যে এখানেও আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত হয় নিত্য-নতুন মিথ্যা, অহিফেনের নব-নব সংস্করণ। এদের একটি তার কার্যকারিতা হারালে অন্যটি এসে দখল করে তার স্থান।

আট

আমাদের দেশে সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই অহিফেনের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সাহিত্যকীর্তি। একে সর্বশেষ বললে হয়তো ভুল হবে। কারণ নজরুলকে এভাবে ব্যবহারের চেষ্টা পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাংলায় প্রথম থেকেই দেখা গেছে। কিন্তু তা হলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে বর্তমানের সংগঠিত প্রচেষ্টার তুলনায় সে পূর্ব-প্রয়াসের গুরুত্ব তেমন কিছুই ছিলো না।

কিন্তু সে প্রচেষ্টার গুরুত্ব না থাকার কারণ তখন পর্যন্ত অন্য অহিফেনের কার্যকারিতা খর্ব হয়নি। তখন তাদের হাতের মুঠোয় ছিল আরবী হরফ, রাষ্ট্রভাষা উর্দু, বাংলা ভাষায় নতুন আরবী-ফারসী শব্দের আমদানী, বাংলা সাহিত্যের 'হিন্দু ঐতিহ্য', রবীন্দ্র-বিরোধিতা এবং আরো অনেক কিছু। তখন নজরুল সাহিত্যকে বাদ না দিলেও তার থেকে উপরোল্লিখিত অন্য অহিফেনের কার্যকারিতা ছিলো অনেক বেশী।

কিন্তু পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে এ সব নেশা কাটিয়ে উঠলেন এবং সেদিক থেকে রবীন্দ্র-বিরোধিতার আংশিক পরাভব এ-দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে বাদ দেওয়ার আন্দোলনকে বিশেষভাবে অবলম্বন না করে যা কিছুকে অস্বীকার করার উপায় নেই তার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার ওপরই হলেন অধিকতর নির্ভরশীল। এই নতুন অহিফেনের সন্ধান মিললো নজরুল ইসলামে। তাই যে নজরুল ইসলাম আজীবন অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য সৃষ্টির সাধনায় রত ছিলেন তাঁকেই আজ ইসলামের কবি, মুসলিম তমদ্দুনের বাহক, মুসলিম জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছে। এবং এ কাজ যাতে উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করা হয় তার জন্যে চলেছে সংগঠিত প্রচেষ্টা, স্থাপিত হয়েছে এই নতুন অহিফেন প্রস্তুত এবং পরিবেশনের বিস্তৃত কারখানা!

নয়

সম্প্রতি একটি বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে 'সুধীবৃন্দে'র দরিরামপুর সাহিত্য সমাবেশের সম্পর্কে কয়েকদিন ধরে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এগুলি থেকে মনে হয় ইসলাম-বিষয়ক ব্যতীত অন্য কিছু সম্পর্কে নজরুল কোনদিন কিছু লেখেননি, 'মুসলিম রেনেসাঁস'ই ছিলো তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এবং তাঁর মতো ধার্মিক মুসলমান তৎকালীন বাংলাদেশে প্রায় ছিলো না বললেই চলে।

সংবাদপত্রটি পরিবেশিত এই বিবরণ যদি অতিরঞ্জিত না হয় তা হলে দেখা যাবে উপরোল্লিখিত সাহিত্য সমাবেশে 'সুধীজনেরা', আমাদের দেশের চলিত ভাষায়, নজরুল ইসলামের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলেছেন। নজরুল দরিরামপুর ইস্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেছিলেন সেজন্যে তাঁরা সেই 'পুণ্যস্মৃতি'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অছিলায় সেখানে গিয়ে নজরুল সাহিত্য এবং নজরুল সঙ্গীতের যে বিশেষ পরিচয়টি দেশের সামনে তুলে ধরেছেন সেটা যে নজরুল সাহিত্যের এবং নজরুল জীবনের যথার্থ পরিচয় নয় সেটা আজ পর্যন্ত অনেকেই ভালোভাবে জানেন। কিন্তু এই কর্মকাণ্ড যদি অব্যাহত থাকে এবং নজরুল ব্যবসায় স্বরূপ যদি যথাযথভাবে জনসাধারণের সামনে উদ্‌ঘাটিত না হয় তা হলে কিছুদিন পরেই নজরুল সাহিত্য অহিফেনরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনাকে

অনেকখানি বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হবে। একজন্যেই আজ প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই নজরুল প্রীতি ও নজরুল সাহিত্য চর্চার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রভাবশালী মহলের অর্থ-পরিপুষ্ট এই সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলামের অহিফেনে রূপান্তরকে আজ তাই বন্ধ করতেই হবে। তার জন্যে প্রয়োজন নজরুল সাহিত্যের, নজরুল সঙ্গীতের এবং নজরুল জীবনের সত্যিকার চিত্র জনসাধারণ ও সংস্কৃতিকর্মীদের সামনে উপস্থিত করা। এভাবেই বাধা দিতে হবে নজরুলকে সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ারে পরিণত হওয়া থেকে, এভাবেই সৃষ্টি করতে হবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থ চেতনার, যে চেতনা সক্ষম হবে আমাদের সামগ্রিক জীবনকে সুন্দর ও শোষণমুক্ত করতে।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর একটা চেষ্টা এখন সাম্প্রদায়িক মহলে আড়ম্বরের সাথে শুরু হয়েছে। এ প্রচেষ্টা এবং আড়ম্বরের সাথে সাহিত্য অথবা সংস্কৃতিচর্চার যে কোন সম্পর্ক নেই এ কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার।

প্রত্যেক সংস্কৃতি ও সাহিত্যেরই একটা সামাজিক বুনিয়াদ থাকে যাকে অস্বীকার করে সংস্কৃতি বা সাহিত্যচর্চা করা অথবা তার সম্পর্কে কোন ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও কথাটি বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সাহিত্য সংস্কৃতির বৃহত্তর বৃত্তের অন্তর্গত, তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দুই

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রথম বক্তব্য এই যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ 'হিন্দু' লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের এক-একজন দিকপাল এবং সেই হিসেবে তারাই ঐতিহ্যবাহী এবং তাঁদেরকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত উপরোক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য যথার্থ। কারণ বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কে যাদের কিছুমাত্র ধারণা আছে তারাই জানে সে ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন বলা হয় যে উপরোক্ত সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী হলেও 'আমাদের' অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের, সংস্কৃতির সাথে তাঁদের কোনরকম ঐতিহ্যিক বন্ধন নেই। কেউ এ কথা বললে প্রথমেই সেটাকে ক্ষিপ্তচিত্ততার লক্ষণ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাবে যে এক্ষেত্রে পাগলামীটি নিতান্তই পরিকল্পিত!

তিন

প্রত্যেক সাহিত্য এবং সংস্কৃতিরই একটা ঐতিহাসিক চরিত্র থাকে। এজন্যেই শাশ্বত সাহিত্য অথবা সংস্কৃতি বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। সাহিত্যের ইতিহাসে তাই দেখা যায় যে এক-এক যুগে বিশেষ-বিশেষ দেশের সাহিত্যে কতকগুলি বিশেষ অবস্থা এবং সমস্যার ওপর গুরুত্ব পড়ে। সেগুলিকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে সেই সব যুগের সাহিত্য। আমাদের দেশও সেদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব শুরু। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এ সাহিত্যের উপজীব্য কী সে হিসেব নিলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে আশ্চর্য রকম পার্থক্য আছে। বিদ্যাসাগর যে সব বিষয় অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করেছেন সেগুলি মোটামুটিভাবে হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত অথবা তাদের থেকেই উদ্ভুত। তিনি যে অন্য-কিছু লেখেননি তা নয়। কিন্তু তাঁর রচনায় এগুলিই হলো প্রধান উপজীব্য। তবে এক্ষেত্রে তাঁর বিশেষত্ব এই যে বিষয়বস্তুর এ পরিচয় সত্ত্বেও বক্তব্যের গুণে তিনি সেগুলির ওপর আধুনিকতার ছাপ এমন সুস্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে মুদ্রণ করেছিলেন যেটা অনেক অত্যাধুনিক সাহিত্যিকের পক্ষেও পরবর্তীযুগে সম্ভব হয়নি। এদিক থেকে মাইকেল মধুসূদনের সাথে তাঁর অনেকখানি মিল এবং সাদৃশ্য। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর ক্ষেত্রে সহজেই লক্ষ করা যায় বিষয়ের প্রকারভেদ। সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজচিত্র অঙ্কনেই তিনি অধিকতর ব্যাপৃত। নবোত্থিত উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্তকে তিনি তাঁর লেখায় অগ্রাহ্য করেননি, কিন্তু তারা তাঁর সাহিত্যের মূল অবলম্বন নয়। অবশ্য সামন্ত সমাজ এবং মূল্যবোধকে বিশেষভাবে অবলম্বন করলেও ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিকতার ছাপ তাঁর লেখাতেও সুস্পষ্ট। তার অন্যতম প্রধান কারণ একদিকে বঙ্কিমের নতুন ঐতিহ্য চেতনা এবং অন্যদিকে ইওরোপীয় সাহিত্যের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এর ফলেই তিনি বাংলা সাহিত্যে জন্ম দিতে পেরেছিলেন ঐতিহাসিক এবং আধুনিক উপন্যাসের। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের রূপটি আধুনিক হলেও বাঙালী মধ্যবিত্তের নতুন চিন্তাভাবনা তাঁর উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়-

নি বরং সেই নতুন চিন্তাভাবনার যে প্রতিক্রিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো তিনি ছিলেন সেই প্রতিক্রিয়ারই সাহিত্যিক ও দার্শনিক মুখপাত্র।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য একটি বিচিত্র মহাদেশ। বিষয়বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে তার তুলনা নেই। তাঁর হাতে আমাদের সাহিত্য যে ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়েছে তার সঠিক হিসেব নির্ধারণও সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের প্রথম বিশ্বপরিচয়। তাঁর সৃষ্টিকর্মই হলো বহু বিদেশী সভ্যতার সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগসাধনার শ্রেষ্ঠতম ফসল। আমাদের দেশের এক যুগসন্ধিক্ষণে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বহু বিচিত্র পথ একের পর এক উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সবকিছুই হয়েছিলো তাঁর অন্তরে মুদ্রিত এবং সাহিত্যে প্রতিফলিত। এজন্যেই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য কী এ আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ। তাঁর বিশাল প্রতিভা, বিপুল অভিজ্ঞতা এবং অপূর্ব রচনা-শৈলী তাঁর ঐতিহাসিক যাত্রাপথে নব-নব দিগন্ত রচনা করেছে। তবু রবীন্দ্র-যুগকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-শিল্প-সাহিত্যের কোন মূল্যায়নই সম্ভব নয়। সেদিক থেকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মেরই একটা ঐতিহাসিক চরিত্র আছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম নিয়ে এলো মধ্যবিত্তের একটা ঘরোয়া আবহাওয়া। এখানেই শরৎ-সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। মধ্যবিত্তকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম অচিন্তনীয়। "মহেশে"র মতো গল্প তিনি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সেটি নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। যে যুগে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সে যুগে মধ্যবিত্তেরই প্রাধান্য এবং সেই প্রাধান্যের চিহ্ন তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র! কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনকে বিশেষভাবে অবলম্বন করলেও বিশ শতকীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সাথেও তিনি আবার সম্পূর্ণ একাত্মবোধ করেননি। এজন্যে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যের প্রভাব তাঁর চিন্তার মধ্যেও সহজেই প্রত্যক্ষ।

এরপর এলো বাংলাদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের এক নুতুন যুগ এবং সেই নতুন যুগে আবির্ভূত হলো নতুন শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যে কবির পদধ্বনি শুনেছিলেন সেই পদক্ষেপেই বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম সুকান্তের আবির্ভাব। এই শতকের বিশের থেকে চল্লিশে বাংলাদেশে চাষী মজুরেরা ধীরে-ধীরে মাথা তুললো, নিজেদের দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে হলো ক্রমশ সচেতন ও সতর্ক। কবি নজরুল এবং বিশেষ করে সুকান্ত মুখ্যত তাদেরই

কবি, তাঁরা তাদেরই প্রতিনিধি। এর মধ্যেই তাঁদের পরিচয়ের মুখ্য রূপ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে আমাদের দেশের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং অগ্রগতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু ধারণা সম্ভব নয়। এ কথা শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, যে কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' অথবা মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' কেন লিখেছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' 'গৃহদাহ', নজরুলের 'অগ্নিবীণা', তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কেমন করে সম্ভব হলো এর জবাব তাঁদের সমসাময়িক সামাজিক ও আর্থিক জীবন থেকেই পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়। মধ্যবিত্ত চরিত্রের মধ্যেও যে পরিবর্তন এসেছে সেটাও আমাদের সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। এজন্যে শরৎচন্দ্রের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপুষ্ট মধ্যবিত্ত এবং তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত এক নয়। তাদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা বাংলাদেশের এক যুগের সাথে অন্য যুগের।

বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের সাহিত্যের উপজীব্য সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য সমাজের সাহিত্যের সাথে গভীর সম্পর্কের কথা স্মরণ করা। আমাদের চিন্তাভাবনা, শিল্পসাধনা সবকিছুই যে বিশেষ-বিশেষ সামাজিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সত্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে শুধু সাহিত্যেরই নয়, আমাদের সমগ্র সংস্কৃতিরই উৎসমূল আমাদের সামাজিক জীবনভূমি। সেদিক থেকে সাহিত্য এবং সংস্কৃতি একই সূত্রে গ্রথিত এবং এই সূত্রকে ছিন্ন করার কোনই উপায় নেই।

চার

জীবনচর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার বিহার চলাফেরা, তার শোক তাপ আনন্দ বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা সাহিত্য ভাষা, তার দিনরাত্রির হাজারো কাজকর্ম, সবকিছুর মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়। এজন্যে তার সামগ্রিক সংস্কৃতিও অসংখ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলির মধ্যে কিসের প্রভাব বেশী কিসের কম সেটা নির্ভর করে বিভিন্ন জিনিসের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতার তারতম্যের উপর। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে আর্থিক অবস্থার গুরুত্বই মানুষের জীবনে সব-

থেকে বেশী এবং তার দ্বারাই সংস্কৃতি সবথেকে বেশী প্রভাবিত। এর অর্থ এই নয় যে সকলেই অর্থগৃধ্নু, সকলেই অর্থ রোজগারের মোহে আচ্ছন্ন। এর সরল অর্থ এই যে মানুষের আর্থিক জীবনকে কেন্দ্র করে তার কতকগুলি স্বার্থ, বিবেচনা এবং ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে যেগুলিকে সাধারণত অস্বীকার করা চলে না। শুধু তাই নয়। সেগুলি সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে মানুষের অন্তরের গভীর দেশে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ব্যক্তিমানস লাভ করে তার বিশেষ চরিত্র।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগে-যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিকের চিন্তা এবং সাধনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি সে পরিবর্তন এসেছে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে। ইংরেজ আমলের বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার পরবর্তী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধীরে-ধীরে আমাদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এনেছিলো এবং সে পরিবর্তনের ফলে যে নতুন-নতুন সমস্যাবলী দেখা দিয়েছিলো সেগুলিই সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে হয়েছিলো প্রতিফলিত। এজন্যেই দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি করলেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য আবার সাম্প্রদায়িকতাদোষে অনেকখানি দূষিত। তাঁর সাহিত্যের গৌরবও সে কারণে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ। তবে শুধু বঙ্কিমই নয়, তাঁর পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত লেখকদের অধিকাংশের মধ্যেই অল্পবিস্তর সাম্প্রদায়িক প্রভাব বর্তমান। সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মুখ্য কারণ বাংলাদেশের সমাজদেহে তার উত্থান এবং প্রতিষ্ঠা। সমাজের মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে যা বর্তমান ছিলো সাহিত্যের মধ্যে সেটাই হয়েছিলো প্রতিফলিত। সেই দূষিত প্রভাবকে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামের মতো কারো-কারো থাকলেও সকলের সে ক্ষমতা ও মানবচেতনা ছিলো না।

উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ব্যাপক হওয়ার কারণ আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার ক্রমাগত প্রভাব বৃদ্ধি। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক প্রভাব সত্ত্বেও তার বাইরে বাংলাদেশের মানুষের কোন চিন্তাভাবনা, বিচার-বিবেচনা, শিল্পসাধনা ছিলো না এমন নয়। তাছাড়া সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসল-

মানের পারস্পরিক প্রভাব ছিলো অপ্রতিরোধ্য এবং ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখক ও শিল্পীর অধিকাংশ সৃষ্টিকর্মই সম্পূর্ণভাবে সম্প্রদায়িকতা মুক্ত।

পাঁচ

শুধু আধুনিক কালেই নয় পুরাতন আমলেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিবিধ আন্দোলন সত্ত্বেও তার অখণ্ডতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যকেই আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। চৈতন্যদেব যে ধর্ম প্রচার করলেন এবং তার থেকে প্রেরণা লাভ করে যে বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি হলো তাকে 'হিন্দু' অথবা 'মুসলিম' আখ্যা দেওয়া চলে না। কারণ এই ধর্মসাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় এবং ইসলাম ধর্মীয় প্রভাব অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। বৈষ্ণব সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু সাহিত্য আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল প্রেরণা ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ব ও মানবতা থেকেই উদ্ভূত। হিন্দু সমাজের কাঠামোর মধ্যে এমন-কিছু ছিলো না যার থেকে সরাসরিভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের উদ্ভব হতে পারতো। এ ধর্মসাহিত্য ইসলামের সাথে হিন্দু ধর্মের সমন্বয়েরই সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এজন্য বৈষ্ণব সাহিত্য এবং কীর্তন বাংলার হিন্দুদের যতখানি আপন মুসলমানদেরও ঠিক ততখানি!

কাজেই কেউ যদি বলেন যে বৈষ্ণব সাহিত্য অথবা কীর্তন মুসলমানদের পক্ষে বিজাতীয় তা হলে শুধু যে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞানতাই প্রমাণিত হবে তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও তার দ্বারা হবে বিকৃত। বৈষ্ণব সাহিত্যে হিন্দু ধর্মীয় এবং ইসলামী চিন্তার যে সমন্বয় সাধিত হয়েছিলো সেটা কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি সে সমন্বয় সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাধিত না হতো। কাজেই সাহিত্যের এ সমন্বয়কে স্বীকার করলে সাংস্কৃতিক সমন্বয়কেও স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধু এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশে এই সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছিলো কারণ বাঙালী জীবনের মধ্যে তার প্রয়োজন হয়েছিলো অনুভূত। এ সমন্বয় একটি বিশেষ ধর্মীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করলেও তাই তাকে সমগ্র বাঙালী জীবন থেকে আলাদাভাবে

বিচার করা চলে না।

বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে একই ঐতিহ্যের ধারা কীভাবে প্রবাহিত তার অন্য একটি বিশিষ্ট উদাহরণ নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সাধনা। তাঁর এই সাধনার মধ্যে সমগ্র বাঙালী সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়েছিলো। তিনি অনেক ইসলামী গান রচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সে গানগুলিও যে ঐতিহ্য বহন করে তাকে সমগ্র বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। এই প্রসঙ্গে 'তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে' নজরুল ইসলামের এই বিখ্যাত গানটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই গানটিকে নজরুল-মানসের ইসলামী চরিত্রের প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে গানটিতে হজরত আমেনার কোলে রসুল মহম্মদের আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাবের মহিমা বর্ণনা করলেও সমগ্র গানটিতে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিরা মা যশোদার কোলে শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে কল্পনা করেছেন, যেভাবে সেই আবির্ভাবের মহিমা কীর্তন করেছেন, নজরুল ইসলাম উপরোক্ত গানটিতে হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের মহিমা সেই একইভাবে কীর্তন করেছেন। সেজন্যে এই তথাকথিত ইসলামী গানটিকে ইসলামী তত্ত্বের দিক থেকে 'ইসলামী' আখ্যা দেওয়া চলে না। মাতৃরূপের এই বন্দনা ইসলামী তত্ত্বের পক্ষে সম্পূর্ণ বিজাতীয়। কাজেই গানটিতে হজরত মহম্মদ এবং হজরত আমেনার কথা আছে বলেই সেটি যে মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী এ কথা সত্য নয়। এ গানটি যে ঐতিহ্য বহন করে তার নাম হিন্দু অথবা মুসলমান নয়, তার নাম বাঙালী ঐতিহ্য যার মধ্যে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং অন্যান্য অনেক-কিছুরই অবাধ সমন্বয়।*

শুধু এই একটি-দুটি গানই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে স্বার্থমুক্ত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে বিভাগপূর্ব কাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি অবিভাজ্য এবং অখণ্ড। দেশ বিভাগের পর আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবন তফাৎ হওয়ার ফলে দুই বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পার্থক্য দেখা দেবে কিন্তু তাই বলে কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য মানুষই নিজের অতীতকে, অতীত সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে পারে না।

* গানটির এ দিকটি সম্পর্কে অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম আমার কাছে প্রথম উল্লেখ করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতিকে পিতৃমাতৃপরিচয়হীন মনে করার কোন কারণ নেই। এ সংস্কৃতি ১৯৪৭ সালের ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত হাজার বছরের যে বাঙালী সংস্কৃতি তারই ঐতিহ্যবাহী, তার মধ্যেই আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির অনস্বীকার্য জন্ম-পরিচয়।

কোন ভাষা এবং সাহিত্য যখন যুগ-যুগ ধরে গঠিত হতে থাকে তখন অসংখ্য ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সেই গঠনকার্য সম্ভব হয়। দৈনন্দিন জীবনযাপন ও সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে মানুষের মনে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং উপলব্ধির সঞ্চার হয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সেটাই হতে থাকে ক্রমাগত প্রতিফলিত। এজন্যেই ভাষা ও সাহিত্য যে কোন সমাজের সাংস্কৃতিক মান নির্ণয়ের অন্যতম মানদণ্ড। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন ভাষার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। হাজারো মানুষের সমবেত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা গড়ে ওঠার ফলে সমগ্র সংস্কৃতি, সাহিত্য, অথবা ভাষাকে 'আমার' অথবা 'তোমার' বলে চিহ্নিত করার উপায় নেই। এ সৃষ্টিকার্যে সকলেই শরিক এবং এ সৃষ্টি যৌথভাবে সকলেরই। একটি কারখানা, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করলে তার মধ্যে অল্পবিস্তর বহু লোকের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা থাকে। কিন্তু কারখানা, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র অথবা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে প্রতিষ্ঠাতা অথবা পরিচালনাকারীদের মধ্যে কেউই একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি বলে দাবী করতে পারেন না। এগুলি সম্পর্কে যে কথা সত্য ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে কথাই আরো হাজারগুণে বেশী সত্য।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সবথেকে বেশী নতুন শব্দ সংযোজন করে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন, তাঁর সাহিত্যচর্চার দ্বারা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে করেছেন অতীব ঐশ্বর্যশালী। বস্তুতপক্ষে আজ আমরা যে ভাষায় কথা বলি সে ভাষাও বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। কিন্তু তাই বলে এ ভাষা ও সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের একক সৃষ্টি নয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মৌল বস্তু যেমন অন্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে তাপ চাপ এবং অন্যান্য অবস্থার গুণে জন্ম দেয় এক নতুন সত্তার, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটিই ঘটে থাকে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে সত্তার অবিভাজ্যতা আরও কঠিনতর সত্য। কারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বস্তু নতুন সত্তা সৃষ্টি করলেও রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা বস্তুগুলি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হতে

পারে। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে কাজ আর কিছুতেই সম্ভব নয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সাধনা ব্যক্তিবিশেষের কিন্তু তার ফল সমগ্র সমাজের, সর্বসাধারণের। কাজেই সৃষ্টির পর ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ সেই সৃষ্টির ওপর আর অবশিষ্ট থাকে না। স্রষ্টাকে মানুষ বিস্মৃত হয় কিন্তু তার সৃষ্টির ব্যবহারকে বিস্মৃত হয় না। উপরন্তু তাকেই অবলম্বন করে সমাজ ও সভ্যতাকে করে অগ্রবর্তী।

কাজেই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা গোষ্ঠী যেই হোক না কেন, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার যতই অবদান থাক না কেন, সেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত দানের ভিত্তিতে সাহিত্য-সংস্কৃতির অখণ্ডতাকে সে খর্ব করতে পারে না। বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে সেই অখণ্ড সত্তার মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন প্রভাব হয়তো বাড়ে অথবা কমে কিন্তু সেই প্রভাবের গুরুত্ব বিচার সেই সাহিত্য অথবা সংস্কৃতির অখণ্ডতাকে খর্ব করে সম্ভব নয়। সে চেষ্টা যে করবে সে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতিসাধনের পরিবর্তে তার ধ্বংস-সাধনেই প্রবৃত্ত হবে।

সাহিত্য-সংস্কৃতির চরিত্র অনেকটা সমুদ্রের মতো। ছোট-বড়ো অসংখ্য ধারা ক্রমাগত তার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে তাকে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে কিন্তু সাগর তার নিজস্ব মহিমায় থাকে মহিমান্বিত। এ মহিমা অগণিত অসংখ্য ধারার মধ্যে কোন বিশেষ একটির দ্বারা সৃষ্টি নয়। এ মহিমা যৌথ সৃষ্টি এবং সমুদ্রের একান্ত নিজস্ব।

আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। জীবনচর্চাকালে আমরা যে হাজারো শব্দ ব্যবহার করে হাজারো নিত্য নতুন ভাব ও ধারণার জন্ম দিচ্ছি সে শব্দগুলির কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র, কোনটি মাইকেল-বঙ্কিম, কোনটি দীনবন্ধু, মোশাররফ হোসেন, কোনটি রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত অথবা নজরুল ইসলামের দান। প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যকর্মীই নিজ-নিজ প্রতিভা অনুসারে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন কিন্তু আজ আমরা তার নিখুঁত হিসেব রাখি না, সে হিসেবে চর্চার প্রয়োজনও তেমন নেই এবং সে কাজ তেমনভাবে সম্ভবও নয় আর।

সেজন্যে আজ যে কোন বাঙালী, সে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান যে ধর্মেরই হোক, বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে গেলে যে শব্দগুলি ব্যবহার করবে, যে ভঙ্গিতে নিজের ভাব ব্যক্ত করবে এবং যে ভাবকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে

চাইবে তাদের সবকিছুই তার এক অখণ্ড ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত, তার থেকে অবিচ্ছিন্ন।

কোন ব্যক্তি যদি এখন মনে করেন যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নজরুল ইসলাম প্রমুখের সংযোজিত শব্দ বাদ দিয়ে অথবা তাঁদের প্রভাবকে বীর-বিক্রমে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে এক অদৃষ্টপূর্ব বিপ্লব সাধন করবেন তা হলে তাঁর সে প্রচেষ্টা হয় সম্পূর্ণভাবে মূঢ়তাব্যঞ্জক নয়তো প্রতারণামূলক।

ছয়

উনিশ শতকেই বাংলা সাহিত্য তার আধুনিক রূপ লাভ করে। আধুনিক বাংলা গদ্যরীতিও মোটামুটিভাবে এইসময় গঠিত হয়। বাংলা সংবাদপত্রেরও ইতিহাস সেই থেকেই শুরু।

বাংলা সাহিত্যের এই পর্যায়ে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান এ সব প্রশ্ন অনেকাংশে ছিলো অবান্তর। এজন্যেই দেখা যায় রামমোহন একদিকে বহু ধর্মচর্চা করছেন, ফারসী সংবাদপত্র সম্পাদনা করছেন এবং অন্যদিকে বাংলা ভাষায় সৃষ্টি করছেন নিজের ধর্মসাহিত্য। বিদ্যাসাগর পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে যে গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করছেন সেই গদ্যরীতিই সমগ্রভাবে বাঙালীর দ্বারা স্বীকৃত, অনুসৃত এবং নব-নবরূপে রূপান্তরিত। এজন্যেই ১৮৩১ সালে বাংলা ভাষায় মুসলমান পরিচালিত প্রথম সাময়িক-পত্রের নাম আরবী-ফারসীতে না হয়ে হলো 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'। এ নাম যে আরবী-ফারসীতে হতে পারতো না তা নয়। কিন্তু সাময়িকপত্রের নাম যে আরবী-ফারসীতে হতেই হবে এমন কথা সেকালে ছিলো না। সাময়িকপত্রটির নাম যে 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' হলো এ নিয়ে কোন বিতর্কেরও সূত্রপাত হয়-নি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ অথবা বিশের প্রথমার্ধে মুসলমান পরিচালিত যে সমস্ত সংবাদ ও সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হলো তাদের নাম হলো আরবী-ফারসীতে। উনিশ শতকের শেষ দিকে আরবী-ফারসী নামওয়ালা পত্রিকার সাথে 'সুধাকর', 'মিহির', 'হিতকরী', 'লহরী' ইত্যাদি কতকগুলি বাংলা নামধারী পত্রিকাও পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ শতকের পত্র-পত্রিকার বাংলা নাম দেবার রেওয়াজ প্রায় উঠেই গেলো। বাংলার বদলে সেখানে কেবল আরবী-ফারসীর ভীড়। তার থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে মুসলমানেরা এইসময়ে

বাংলা নামকরণের আর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের চেতনার মধ্যে এই পরিবর্তনের কারণ সন্ধান করতে হলে আলোচিত সময়ের মধ্যে শুধু মুসলমান সমাজ নয়, সমগ্র বাঙালী সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিলো তার হিসেব নিতেই হবে।

বাংলা গদ্যের কথায় ফিরে গেলে বলতে হয় যে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতি প্রবর্তন করলেন সেটা হলো সমগ্র বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব। শব্দ-চয়নের দিক থেকেও এ কথা প্রযোজ্য। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কিছু মুসলমান লেখক সংস্কৃত শব্দ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আরবী-ফারসীর জিগীর যেভাবে তুলেছিলেন এবং তাঁদের পূর্ব-পাকিস্তানী উত্তরসূরীরা এখন ঢাক ঢোল পিটিয়ে যেভাবে সেই জিগীরকে শতগুণে আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন সে-রকম কোন প্রচেষ্টা প্রথমদিকে ছিলো না। এজন্যে সে সময় মুসলমান লেখকেরা গদ্যরীতি এবং শব্দচয়নের ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্যের আওয়াজ তোলেননি। তথাকথিত মুসলিম ঐতিহ্যের বর্তমানে বর্ণিত ইতিহাসটি যদি সে আমলের কল্পিত কাহিনী না হয়ে হাজার বছরের হতো তা হলে সে আমলের মুসলমান লেখকেরাও সমানভাবে তারই জিগীর তুলতেন। কিন্তু বস্তুত তাঁরা তা করেননি। মীর মশাররফ হোসেন যদি তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় হন তা হলে তাঁর গদ্যের নমুনাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। সে নমুনার মধ্যে আমরা কোন সাম্প্রদায়িক আস্ফালন অথবা 'মুসলিম সংস্কৃতি' উদ্ভূত বাক্যবিন্যাসের দেখা পাই না। সে গদ্য এবং শব্দরীতি মীর মশাররফেরও যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়েরও ঠিক তেমনি।

সাত

ভাষা মানুষের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এ স্বীকৃতির কারণ ভাষার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাহিত্যই সৃষ্টি করে না, ভাষা, তার জীবিকা অর্জনেরও সর্বপ্রধান হাতিয়ার; এই ভাষা যদি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সৃষ্টি হয় তা হলে তার মাধ্যমে সমগ্র বাঙালী জীবনের যে ঐক্যসূত্র তাকে অস্বীকার করবে কে?

উনিশশো বাহান্নো সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষার দাবীকে দমন করার জন্যে যারা ছাত্রজনতা হত্যা করেছিলো তাদেরও এ কথা ভালোভাবেই জানা

ছিলো যে ভাষা হলো মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান ঐক্যসূত্র। এজন্যেই সে সূত্রকে ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় তারা ছিলো উন্মত্তপ্রায়। সংস্কৃতিকে আঘাত করতে হলে ভাষা ও সাহিত্যকে আঘাত করাই যে প্রয়োজন এ উপলব্ধি তাদের বরাবরই ছিলো এবং সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আজও আছে। এজন্যেই পূর্ব পাকিস্তানের হাজার বছরের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিরোধী আন্দোলন। সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে তারা বিচ্ছিন্ন করতে চায় কারণ তারা জানে যে সত্য অর্থে এ দুই একই ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত এবং সে ঐক্যসূত্র হলো পূর্ব পাকিস্তানের হাজার বছরের জীবন-ভূমি।

আট

বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের কর্ণধার এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকার করা এবং তাঁদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির যোগকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অজ্ঞ মানুষ অথবা বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগীর পক্ষেই সম্ভব। এবং সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা তো মানসিক বিকারেরই এক নিশ্চিত অভিব্যক্তি।

কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রে এটা সত্য অর্থে মানসিক বিকার হলেও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তিদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তাঁদের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে এবং সেই জ্ঞানবুদ্ধির সাথে কিছু পাপও মিশ্রিত আছে। জ্ঞান, বুদ্ধি এবং পাপের এই মিশ্রণের রাসায়নিক ফলকেই বাংলা ভাষায় বলে জ্ঞানপাপী। উপরোক্ত কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তিরা আসলে বিকারগ্রস্ত নন। তাঁরা হলেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাপ বিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ!

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীগত ভূমিকা

ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সংঘর্ষ থেকেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্ম এবং বিকাশ। এই সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক পরিচয় একটি বিশেষ পর্যায়ে প্রাধান্য লাভ করলেও সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী এবং অধিকতর মারাত্মক। কিন্তু মারাত্মক বললেই প্রশ্ন ওঠে এ প্রভাব কার পক্ষে মারাত্মক। এর সহজ উত্তর— জনগণের পক্ষে, কৃষক, মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্তের পক্ষে।

পাকিস্তান আন্দোলনকালে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাই ছিলো মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীদের আদর্শিক হাতিয়ার। হিন্দুদের মধ্যেও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব খুব উল্লেখযোগ্য। উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্যে তার প্রমাণের অভাব নেই।

উনিশ শতকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় রাজনীতি কিছুমাত্র সংগঠিত ছিলো না। তখন সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব হয়েছিলো একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় আবিষ্কার এবং অন্যদিকে আর্থিক জীবনকে নতুনভাবে গঠন করতে গিয়ে। ভারতীয় হিন্দুরা যখন নিজেদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচর্চা শুরু করলেন তখন স্বভাবতই তার মধ্যে দেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রাধান্য পেলো। ইংরেজদের নতুন রাজত্বে যখন আর্থিক জীবনকে নতুনভাবে গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিলো তখন হিন্দুরা সেই অবস্থার সাথে অসুবিধা সত্ত্বেও অনেক তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিতে পারলেন কারণ তাঁদের মনে মোগল সাম্রাজ্য বা বাদশাহী আমলের প্রতি মুসলমান অভিজাতশ্রেণী-সুলভ কোন সুদৃঢ় স্বার্থগত ও ধর্মীয় আনুগত্য ছিলো না। মুসলমানেরা হিন্দুদের এই নতুন সংস্কৃতি ও আর্থিক জীবনচর্চাকে অস্বীকার করলো নিজেদের স্বার্থগত কারণে এবং ধর্মীয় সংস্কারের বশে। কাজেই হিন্দু-মুসলমান সমস্ত পেশাদার শ্রেণীর মধ্যে একটা

দারুণ রেষারেষি এবং শত্রুতার ভাব উনিশ শতকেই সৃষ্টি হলো। এ রেষারেষি এবং শত্রুতা সমাজের উপর তলাতেই ছিলো বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। ভারত-বর্ষের মধ্যবিত্ত রাজনীতি উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে যখন সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করলো তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মধ্যবিত্তেরা নিজেদেরকে একত্রিত করে দাঁড়ালেন পরস্পরের মুখোমুখি।

কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের একটা বড়ো তফাৎ ছিলো। সংখ্যাগুরু হওয়ার ফলে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার মুনাফা মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের ক্ষেত্রে হলো অপেক্ষাকৃত কম। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপেক্ষিক-ভাবে অধিকতর উন্নত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ হিসেবে অনুন্নত ও সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের থেকে আশঙ্কা করার মতো তেমন-কিছু তাদের ছিলো না। সেজন্যেই তাদের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের আদর্শ ছিলো বাহ্যত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এবং সেই হিসেবে তাঁরা ছিলেন অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অখণ্ড ভারতের হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করছিলেন সেই সুবিধার দাবীই ভারতীয় মুসলমানেরা করলেন পাকিস্তানের মাধ্যমে। হিন্দুদের মতে, তাঁরাও এমন একটা এলাকায় প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব দাবী করলেন যেখানে সংখ্যাগুরুত্বের বলে মুসলমানরা তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী-স্বার্থকে সংরক্ষণ ও গঠন করতে পারে। কাজেই বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পরিণামে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের অখণ্ড ভারতের আন্দোলন এবং মধ্যবিত্ত মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। ভাষা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা তাতে ছিলো না। তার মধ্যে ছিলো শুধু ধনতন্ত্র-সুলভ বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার ব্যাপক আয়োজন। এ কথার সত্যতা স্বাধীনতা-উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাস থেকেই বিশেষভাবে প্রমাণিত হবে।

কিন্তু কংগ্রেস-লীগের রাজনৈতিক আন্দোলন যদি সত্যই উচ্চ মধ্যবিত্তের স্বার্থে পরিচালিত হয়ে থাকে তা হলে এ দেশে অগণিত মানুষ, কৃষক শ্রমিক নিম্ন মধ্যবিত্ত সে আন্দোলনে শরিক হলো কেমন করে? এ প্রশ্নের উত্তর আলোচনা-কালেই আমরা সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার চরিত্রের সাথে পরিচিত হবো।

দুই

তত্ত্বগতভাবে সংস্কৃতিকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করাকেই সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার মূলসূত্র বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বিশুদ্ধ সত্যানুসন্ধানের মধ্যে নেই। সে প্রয়োজনীয়তা তার আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকেই উদ্ভূত।

আর্থিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তত্ত্ব, মতবাদ ও আদর্শ নির্মাণ এবং সেগুলিকে বিবিধভাবে প্রচার করে জনসাধারণকে দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষেই স্বাভাবিক। শুধু এ দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এ চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সেদিক থেকে তার মধ্যে নতুনত্ব অথবা দোষের কিছু নেই। কিন্তু এ প্রচেষ্টা দোষদুষ্ট হয় তখনই যখন তত্ত্ব হয় মিথ্যা এবং সেই মিথ্যা তত্ত্বকে শোষকশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোকের স্বার্থের কাজে ব্যবহার করা হয়। জর্মান দার্শনিক কান্ট বলেছেন যে শুভ সঙ্কল্প ছাড়া আত্যন্তিকভাবে শুভ বলে কিছু নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের বশবর্তী যা-কিছু গুণাবলী বা দ্রব্যসামগ্রী সেগুলি সবই সঙ্কল্পের হাতিয়ার। সবগুলিই তার সঙ্কল্পসাধনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজেই বিদ্যা, বুদ্ধি, দক্ষতা, দৈহিক ক্ষমতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি কোন-কিছুকেই সরাসরি ভালোমন্দ বলা চলে না। এগুলি সং সঙ্কল্পসাধনের কাজে ব্যবহৃত হলেই ভালো এবং অসৎ সঙ্কল্পসাধনের কাজে ব্যবহৃত হলেই মন্দ। অর্থাৎ এগুলির কোন নৈতিক চরিত্র নেই। সেদিক থেকে এরা নিরপেক্ষ—যেমন নিরপেক্ষ একটি তলোয়ার, বন্দুক অথবা টাকাকড়ি। এগুলির দ্বারা যদি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয় তা হলেই এরা ভালো অর্থাৎ এদের ব্যবহার ভালো। অন্যথায় এদের ব্যবহার মন্দ। কাজেই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ব্যবহারের ওপরই এদের ভালোমন্দ নির্ভরশীল। এদের কোন আত্যন্তিক নৈতিক চরিত্র নেই।

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তত্ত্বনির্মাণ ও প্রচারণা সম্পর্কেও কান্টের এই বক্তব্য প্রযোজ্য। তাদের এই প্রচেষ্টা দোষদুষ্ট কারণ তা শোষণের মাধ্যমে সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।

তিন

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে সংগঠিত শোষণ নিশ্চিতভাবে শ্রেণীভিত্তিক। মার্ক্স তাঁর শ্রেণীবিশ্লেষণের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সমাজ প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে—একটি শোষক এবং অন্যটি শোষিত। যে শ্রেণীটি শোষণ করে তারা সংখ্যায় অল্প। যারা শোষিত হয় তারাই অধিকাংশ। অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজেই অল্পসংখ্যক লোক সংখ্যাগুরুকে শোষণ করে।

কিন্তু শাসন ব্যতীত শোষণ অসম্ভব। পৃথিবীতে তাই যেখানেই শোষণ সেখানেই শাসন। মানবসমাজে শাসনকে অবশ্য সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ শাসন হলো অত্যাচারিতের ওপর, শোষিতের ওপর অত্যাচারী ও শোষকের শাসন। এর দুই রূপ—একটি বাহ্যিক, অপরটি মানসিক। বাহ্যিক শাসন কায়েম হয় দৈহিক ভয়ভীতির ওপর ভিত্তি করে। তার জন্যে থাকে সৈন্যসামন্ত, পুলিশ, চৌকিদার এবং তাদের তলোয়ার লাঠি বন্দুক। এসব দেখা এবং দেখানোর দ্বারা এক শ্রেণী প্রভুত্ব করে অন্যে পরাভূত হয়। কিন্তু শুধু বাহ্যিক শাসনের দৌলতে কোন শাসনব্যবস্থাই টিঁকে থাকতে পারে না। তার মাধ্যমে শোষণকার্য শান্তির সাথে সম্পন্ন হয় না। শোষিতের সংখ্যা-গুরুত্বই এর কারণ। পৃথিবীতে শোষণকে জারী রাখার জন্যে শুধুমাত্র বাহ্যিক শাসন ব্যতীত যদি অন্য-কিছু না থাকতো তা হলে শোষকশ্রেণীর নিরাপত্তা তাতে অনেক বেশী বিপন্ন এবং শোষণকার্য অনেকাংশে সংযত ও ব্যাহত হতো। শোষণের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরুর বিদ্রোহও হতো অনেক সহজ।

মানসিক শাসনের প্রয়োজনীয়তা এই উপলব্ধি থেকেই উদ্ভূত। শ্রেণী-সংগ্রামের শুরু থেকেই তাই দেখা যায় শোষিত সংখ্যাগুরুর চিত্তশাসনের বিবিধ ব্যবস্থা। এ কাজের জন্যে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাই উপযোগী কারণ সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি যাই হোক পরিণতিতে তা মানসিক। কাজেই বাহ্যিক শাসনের জন্যে যেমন প্রয়োজন লোকলস্কর সেপাই পুলিশ, মানসিক শাসনের জন্যে তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত সাংস্কৃতিক হাতিয়ার।

ইতিহাসের আদিপর্বে মানুষের জীবন-ব্যবস্থা এতো জটিল এবং বিস্তৃত ছিলো না। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উৎপত্তির সাথে-সাথেই মানুষের মনকে

শৃঙ্খলিত করার আয়োজন শুরু হলো। সেই আয়োজনকালে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রতাপ ও মহিমায় মানুষ স্বভাবতই আচ্ছন্ন ছিলো। প্রকৃতি তার কাছে ছিলো এক মহাবিস্ময়, যার প্রায় সবকিছুই তার অজানা। কিন্তু অজানা হলেও মানুষ নিজের প্রকৃতির গুণে তাকে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করতো। এই প্রচেষ্টা থেকেই জন্ম নিলো অতিকথা ও দর্শন, জন্ম নিলো অতিপ্রাকৃত শক্তি। একদিকে তাই তার বাস্তব জীবন-সংগ্রাম এবং অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতি এই দৃষ্টি ভিত্তিস্থাপন করলো মানুষের সংস্কৃতির। শুরু হলো তার সংস্কৃতির আদিপর্ব।

এই আদিপর্ব থেকেই ধর্ম-সংস্কৃতি শ্রেণীশোষণের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত। পরিবেশের সাথে ক্রমাগত সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যে সংস্কৃতির জন্ম তাকে মোচড় দিয়ে, মুখোশ পরিয়ে ব্যবহার করা হলো সংখ্যাগুরুকে জব্দ করার কাজে। এই প্রচেষ্টার ফলেই সৃষ্টি হলো কতকগুলি ধর্ম-দার্শনিক ধারণা—যেগুলির মধ্যে ভগবান, আত্মা ও পরকালই হলো সর্বপ্রধান। আত্মা এমন একটি সত্তা যা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ নয়, জৈবিক নিয়মকানুনও নয় তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেহ জৈবিক, তার জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু আছে। কিন্তু আত্মার তা নেই। আত্মা দেশ কাল এমনকি পাত্রেরও ঊর্ধ্বে। কাজেই সে জাতীয় কোন বন্ধনেই তা আবদ্ধ নয়। কিন্তু সে বন্ধন যদি না থাকে তা হলে মৃত্যুর পর আত্মার স্থান কোথায়? এবার হলো পরকালের আবির্ভাব। দৈহিক মৃত্যুর পর আত্মা বিনষ্ট হয় না, সে অব্যয় অক্ষয়। তাই তার পরকাল আছে, আছে পুনর্জন্ম।

এই আত্মা এবং পরকাল পৃথিবীতে সব ধর্মেরই ভিত্তিপ্রস্তর। কিন্তু এটা শুধু ধর্মেরই ভিত্তিপ্রস্তর নয়, শোষণের হাতিয়ারও বটে। এজন্যে পরকালের সুখের জন্যে ইহকালকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং বিসর্জন দেওয়ার আহ্বান ধর্মীয় শিক্ষার পাতায়-পাতায়— সে ধর্ম আদি অথবা আধুনিক যে পর্বেরই হোক। ধর্মের এই ক্রিয়াকাণ্ডে পুরোহিতকুলের ভূমিকা অতি উল্লেখযোগ্য। ধর্মকে সমগ্র শোষকসমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহার করলেও এই পুরোহিত-গোষ্ঠীই প্রত্যক্ষভাবে ধর্মব্যবসায়ী। এই ব্যবসায় ভিত্তি সামাজিক শোষণের মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত যে উপরোক্ত পুরোহিতগোষ্ঠীর আত্মিক উত্তরপুরুষেরা আজও সংস্কৃতিচর্চার অন্তরালে সেই ধর্মব্যবসাতেই লিপ্ত।

ধর্ম-সংস্কৃতিকে ব্যবসা ও শোষণের কাজে লাগাতে গিয়ে আত্মা ও পরকালের

কথা সবাই বলেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীক এবং বিশেষত ভারতীয় শোষকশ্রেণীর মতো এতো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে অন্য কেউ সক্ষম হয়নি। এ ক্ষেত্রে তাঁদের আবিষ্কার সত্যিই চমকপ্রদ। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে মানুষের শুধু পরকালই নেই, তার একটি পূর্বকালও ছিলো। অর্থাৎ শুধু আত্মা ও পরকালের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের ধর্মদর্শনকে দাঁড় না করিয়ে তাঁরা চেষ্টা করলেন তাকে ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে। সেদিক থেকে তাঁদের চেষ্টা যুক্তিসম্মত। কারণ আত্মা যদি অমর হয় তা হলে এ জন্মকেই তার প্রথম জীবন মনে করার পেছনে কোন নিশ্চিত যুক্তি নেই। দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে তার বারংবার জন্মান্তর সম্ভব। এইভাবে সূত্রপাত হলো জন্মান্তরের ধারণার, যার দার্শনিক পরিণতি কর্মবাদে। শোষণের ইতিহাসে মানুষের চিত্তশাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে কর্মবাদকে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা চলে। কৌশলের দিক থেকে সত্যিই তা অতুলনীয়।

জন্মান্তরের ধারণা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর শোষণকে শান্তিপূর্ণ করা অনেক সহজ হলো। যে মানুষ দুঃখকষ্ট পেয়ে জীবনধারা পরিবর্তনের চিন্তা ও চেষ্টা করতো তাকে বলা হলো যে তার বর্তমান অবস্থার সাথে এ জীবনে যা-কিছু ঘটছে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ জীবন তার দুঃখময় কারণ বিগত জীবন তার ছিলো পাপপূর্ণ। বর্তমান জীবন পূর্বজন্মের দ্বারাই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। কাজেই কারো কিছু করার নেই। যে অন্যায়ভাবে সুখে আছে তার সুখকে বিপর্যস্ত করা অথবা যে দুঃখকষ্টে জর্জরিত তার দুঃখকে দূর করা এ দুই-ই অসম্ভব।

এই দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগ বহুলবিস্তৃত। সর্বপ্রকার শোষণের ব্যাখ্যাই এর দ্বারা সম্ভব। একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি দুর্বলকে প্রহার করে তা হলে প্রহৃত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলের বলার কিছু নেই। কারণ তার এই দুর্দশা তার গতজন্মের কৃতকার্যের ফল। বিগত জন্মে সে অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করেছিলো কাজেই এজন্মে তার প্রায়শ্চিত্ত। কেউ যদি কাউকে বেগার খাটায়, কারো জমি অপহরণ করে তা হলেও সেই একই যুক্তি। বেগার দেওয়া ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই গতজন্মে কাউকে বেগার খাটিয়েছে। তেমনি এ জন্মে একজনের জমি অপহৃত হওয়ার কারণ পূর্বজন্মে অন্যের ওপর তার অনুরূপ অত্যাচার। কাজেই যারা শোষিত অত্যাচারিত তাদের বলার অথবা করার কিছু নেই। তাদের

অবস্থার জন্যে সত্যি অর্থে ইহজন্মের শোষক-অত্যাচারীরা দায়ী নয়, দায়ী তার পূর্বজন্ম!

কিন্তু এই কৌশলের সবথেকে আশ্চর্য এবং উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই যে অত্যাচারিত ও শোষিত শ্রেণী এই তত্ত্বকে আত্মসাৎ করার ফলে শোষকদেরকে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। প্রচারণা ও আশৈশব শিক্ষার ফলে এ বিশ্বাস ছিলো শোষিত মানুষের ধর্মবিশ্বাসেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু তাই নয়। তাদের এই বিশ্বাসকে উচ্ছেদের সাধ্য এবং সাহস কারো ছিলো না। লেনিন এ কারণেই ধর্মকে তুলনা করেছিলেন অহিফেনের সাথে। অহিফেনের ঘোরে মানুষ যেমন নির্জীব হয়ে থাকে, তার কর্মশক্তি রহিত হয়, বুদ্ধি হয় বিভ্রান্ত, ঠিক তেমনি এজাতীয় ধর্ম-দার্শনিক প্রচারণাতে মানুষের মনুষ্যত্ব হয় বিধ্বস্ত, তার চিন্তা কর্ম-শক্তি হয় লুপ্তপ্রায়।

চার

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথাই বোঝা যায় যে একটা বিশ্বাস সর্বজনীনভাবে মানুষের অন্তরে খুঁটি গেড়ে থাকলেই যে সেটি তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। উপরন্তু বলা যেতে পারে যে মানুষের এমন কতক-গুলি সর্বজনীন বিশ্বাস আছে যেগুলির হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভই মানুষের সত্যিকার আত্মিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। এর থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে মানুষের জীবনে বিশ্বাসের একটা সুফলপ্রসূ ভূমিকা থাকলেও সর্বপ্রকার বিশ্বাসই সে দাবীর অধিকারী নয়।

পাঁচ

মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার ফলে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্ম এবং মুসলমানদের সেই পৃথক সাংস্কৃতিক জীবনকে রূপদানের উদ্দেশ্যে পাকি-স্তানের প্রতিষ্ঠা, এই বিশ্বাসের উদ্ভব আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং সংখ্যাগুরু কৃষক শ্রমিকদেরকে নিজেদের শ্রেণীগত উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে প্রচারণার মাধ্যমে এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করেন। এ বিশ্বাসের যে কোন দৃঢ় বাস্তব ভিত্তি ছিলো না সেটা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী অধ্যায়ে প্রমাণিত

হয়েছে। কৃষক শ্রমিক নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনে, সে জীবন সাংস্কৃতিকই হোক বা আর্থিক, পাকিস্তান কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনেনি। সে উন্নতি এসেছে মধ্যবিত্তের জীবনে যে মধ্যবিত্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে নিজেদের স্বার্থকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে করে চলেছে ক্রমাগত সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত।

হিন্দুদের থেকে এখন তাদের আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারা আজ মোটামুটিভাবে নিশ্চিন্ত। এজন্যে এই নতুন মধ্যবিত্তের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত প্রভাব ক্রমশ বিনষ্ট হচ্ছে। তারা সবকিছুকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে বিচার করতে চেষ্টা করছে এবং স্বদেশের সাথে স্থাপন করতে চাইছে নিজেদের অন্তরের নিরবচ্ছিন্ন যোগ। কাজেই পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যে মুসলমান মধ্যবিত্তের মানসিক গঠন ছিলো পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক তাদেরই আজ মোহমুক্তি ঘটেছে, তারাই আজ ধীরে-ধীরে স্বাদেশিকতার আহ্বানে নেতৃত্ব দিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনে। এ কাজ তারা করেছে কারণ দেশের বর্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা তার উন্নতির পথে অনেকাংশে বিঘ্নস্বরূপ। রাজনীতিক্ষেত্রেও সেজন্যে মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং তার থেকে তার আওয়ামী লীগে উত্তরণ।

ছয়

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বর্তমান মুসলিম বাঙালী মধ্যবিত্ত যদি উপকৃত না হয় তা হলে পাকিস্তানোত্তর সাম্প্রদায়িকতায় উপকৃত হচ্ছে কারা? এ প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর আলোচনা এদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে বিশ্লেষণ ও চালনার পক্ষে অপরিহার্য।

প্রথমেই অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ নিজেরাই সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও প্রচারণার দ্বারা প্রতারিত। সাম্প্রদায়িকতায় এ জাতীয় লোকের কোন মুনাফা নেই। এদের অবস্থা অনেকাংশে আফিংখোরের মতো। আফিংয়ের নেশায় মানুষের চিন্তাশক্তি থেকে শুরু করে সব শক্তিই যেমন স্তিমিত হয়ে আসে এবং বহুলাংশে তার স্থান কাল পাত্রের অনুপাতজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ঠিক তেমনি এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীর কুশিক্ষা ও অসৎ প্রচারণার বশবর্তী হওয়ার ফলে তাদের সত্যদর্শনের ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে অবাস্তব কতকগুলি ধারণা তাদের

সমস্ত চিন্তাকে বিকৃত করে। এই বিকৃত চিন্তার ফলে তাদের লাভ না হয়ে পরিশেষে ক্ষতিই হয় কারণ অন্যেরা সেই চিন্তার সুযোগ নিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তাদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু এ সব সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। সাম্প্রদায়িক অহিফেনের মহিমায় তাদের স্বাধীন চিন্তা, কল্পনা ও কর্তব্যবুদ্ধি রহিতপ্রায়। সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা যারা উপকৃত তাদেরকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমটি হলো পাকিস্তানের বৃহৎ বুর্জোয়া এবং দ্বিতীয়টি তাদের দালালগোষ্ঠী, যাদেরকে বলা চলে বৃহৎ বুর্জোয়ার সাংস্কৃতিক মুৎসুদ্দী।

সাত

পাকিস্তানী বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ হলো সামন্তশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে আঁতাত স্থাপন করে শুধু যে এদেশের কৃষক শ্রমিক নিম্নমধ্যবিত্তকে শোষণ করা তাই নয়, এর মাধ্যমে তারা এদেশীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প সামর্থ্যসম্পন্ন বুর্জোয়াদের বিকাশকেও বাধা দান করতে বদ্ধপরিকর। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে বৃহৎ বুর্জোয়ার ভূমিকা স্পষ্টতর হবে।

পাকিস্তানের শিল্পবিকাশের প্রতি লক্ষপাত করলে সহজেই দেখা যাবে যে বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রায় সব অংশটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। এই অবস্থার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ দায়ী নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দুই অংশে আর্থিক, সামরিক এবং চাকরী ও রাজনীতিগত ভারসাম্যের অভাব থেকেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব। কিন্তু কারণ যাই হোক বর্তমানে এই বৃহৎ বুর্জোয়ারা পূর্ব পাকিস্তানে কিছু-কিছু ব্যবসাবাণিজ্য করলেও তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র দেশের এই অংশে নয়। পণ্যশিল্প, বীমা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। যে গুটিকতক সংস্থা আজ পাকিস্তানের অর্থনীতিতে প্রায় একচেটিয়া প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করেছে তাদের সকলেরই প্রধান দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে।

এই বৃহৎ বুর্জোয়ারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে সমানে শোষণ করে চলেছে, এবং অধিকতর শোষণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু দুই অংশের এই শোষণ সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে এক বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই

অবস্থাকে এক কথায় বর্ণনা করতে গেলে বলা চলে যে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত বৃহৎ বুর্জোয়াদের ধনতান্ত্রিক আধিপত্যের ফলে পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের একটা আধা-ঔপনিবেশিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক রাজত্বের 'গৌরবময়' অধ্যায়ে উপনিবেশগুলিকে শোষণ করার সাথে 'পিতৃভূমি'তে ধনতন্ত্রের ক্রমাগত সমৃদ্ধি ও প্রসার হতো এবং উপনিবেশগুলির ধনতান্ত্রিক বিকাশ একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে হতো বাধাপ্রাপ্ত। ঔপনিবেশিক বাজারকে নিজেদের আয়ত্তগত রাখার প্রচেষ্টার ফলেই এটা ঘটতো! বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই উদ্দেশ্যই সাধন করে।

সমগ্র পাকিস্তানের আর্থিক জীবন এবং এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রতি লক্ষ রাখলে দেখা যাবে যে পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে স্বাধীনতা-পূর্ব ঔপনিবেশিক অবস্থাই বহুলাংশে বিরাজ করছে। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে ধনতন্ত্রের বিকাশ এতো শ্লথগতি কেন এর কারণ সন্ধান করলেই এই অবস্থার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে।

বৃহৎ বুর্জোয়ারা শুধু যে কৃষক শ্রমিক নিম্নমধ্যবিত্তকেই শোষণ করছে তাই নয়, তারা অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত বুর্জোয়াদের বিকাশকেও বাধাদান করছে। পূর্ব পাকিস্তানে যেহেতু বৃহৎ বুর্জোয়া বলতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই সেজন্যে পাকিস্তানী অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত (এদের অনেকেই ভারতের বোম্বাই, আহমেদাবাদ, গুজরাট প্রভৃতি এলাকা থেকে আগত) বৃহৎ বুর্জোয়ারা দেশের এই অংশে ধনতন্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ এবং এদেশীয় বুর্জোয়াদের উন্নতিতে বাধাদান করতে বদ্ধপরিকর। তা ছাড়া তারা যে এদেশের আর্থিক জীবনকে বহুলভাবে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনসাধারণকে অন্যান্য দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের মতোই শোষণ করছে এ কথাও তারা চাপা দিতে ব্যস্ত, এ ব্যাপারে তাদের যে কোন সমালোচনারই কণ্ঠরোধ করতে সচেষ্ট।

এইসব উদ্দেশ্যসাধনের জন্যেই সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে কোন সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকলেও তারা সাংস্কৃতিক প্রশ্ন সম্পর্কে উদাসীন তো থাকেই না উপরন্তু সাংস্কৃতিক জীবনকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

সাংস্কৃতিক জীবনকে বিভ্রান্ত করে সুস্থ চিন্তা বিতাড়নের জন্যে প্রয়োজন আফিং—গাঁজা—চরস—সিদ্ধি। এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে আজ তারই বিপুল সংগঠিত আয়োজন সহজেই চোখে পড়ে। শোষক-শ্রেণীর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ধর্মকে ক্ষুদ্র স্বার্থের কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ তো অব্যাহত আছে উপরন্তু তারই ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য উপায়ও একের পর এক হচ্ছে উদ্ভূত ও ব্যবহৃত।

এগুলির মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে প্রচারণাই হলো সর্বপ্রধান। এ কথা যাদের চোখ, কান ও চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা আছে তাদের কারো অবিদিত নেই যে ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে নানাভাবে যারা উপকৃত হয়েছে তারা মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশ। শুধু এখানেই শেষ নয়। এই সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের আয়তন অনেক সম্প্রসারিত এবং অন্যান্য নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের জীবন আর্থিক ও অন্যান্য দুর্যোগে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী বিধ্বস্ত হয়েছে। তা ছাড়া যে ইসলামী তমদ্দুনের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে দাবী করা হচ্ছে তার কোন বিকাশই এই একুশ বছরে এদেশে আর সম্ভব হয়নি।

দেশের এই বর্তমান অবস্থাই পাকিস্তান আন্দোলনের যথার্থ চরিত্র ব্যাখ্যার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহায়ক। ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া আন্দোলনের ফল, সেজন্যে তার মাধ্যমে ফরাসী দেশে বুর্জোয়া রাজত্ব কায়েম হয়েছিলো। রাশিয়া ও চীনের বিপ্লব আন্দোলন মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিলো, সেজন্যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও চীনে স্থাপিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত ছিলো বুর্জোয়া আন্দোলন, কাজেই ভারতে আজ বুর্জোয়া রাজের প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান যদি সত্য অর্থে ধর্মীয় আন্দোলন হতো, তার সত্যিকার প্রাণশক্তি যদি ইসলামী সংস্কৃতির থেকে উদ্ভূত হতো তা হলে স্বাধীনতার পর এদেশেও ইসলামী সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে আর্থিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য এলাকাতেও প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করতো। কিন্তু বস্তুত তা হয়নি। কারণ বাহ্য প্রভেদ সত্ত্বেও কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলনের মতো মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনও মূলত ছিলো বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্দো-

লন। এজন্যে স্বাধীনতার পর এদেশে ইসলামের রাজত্ব কায়েম না হয়ে স্থাপিত হয়েছে বুর্জোয়ার রাজত্ব। পাকিস্তান আন্দোলনের এই হলো সহজ পরিচয় ও পরিণতি। এ পরিচয়কে আজ অস্বীকার করবে কে?

কিন্তু যতো অসম্ভবই হোক-না কেন একে অস্বীকার করার লোক আছে এবং তারাই শ্রেণীগতভাবে হলো পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ বুর্জোয়া সংস্কৃতির মুৎসুদ্দী। তাদের মতে সমগ্র পাকিস্তান আন্দোলন হলো হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলিম সংস্কৃতির জেহাদ এবং এই উদ্ভট মতবাদকে জবরদস্তিমূলকভাবে ঢোল পিটিয়ে তারা প্রচার করতে ব্যস্ত। এই মুৎসুদ্দীরাই হলো এদেশে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার মুনাফাভোগী। বৃহৎ বুর্জোয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের কাজে পূর্ব পাকিস্তানে যারা ব্যাপৃত সংস্কৃতিক্ষেত্রে এরা তাদেরই সহযাত্রী।

নয়

মুৎসুদ্দীদের দ্বিতীয় প্রধান বক্তব্য হলো এ দেশের সংস্কৃতি হয় হিন্দু নতুবা মুসলমান। অর্থাৎ সংস্কৃতি ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র। কাজেই এদেশের লোকেরা যখন ধর্মগতভাবে হিন্দু অথবা মুসলমান তখন তাদের সংস্কৃতিও সেই অনুসারে গঠিত। ধর্মের সাথে সংস্কৃতির এই সম্পর্কস্থাপন যে কতখানি বিভ্রান্তিকর এ কথা সমাজবিজ্ঞানে যার সামান্য জ্ঞানও আছে এবং যে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে নির্লজ্জভাবে বিক্রী করতে প্রস্তুত নয় তার কাছেই ধরা পড়বে। কিন্তু তবু সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সংস্কৃতির এই ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকেন। এবং এ কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বাঙালী সংস্কৃতি এলাকা থেকে হিন্দু শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদেরকে বিতাড়িত করতে ব্যস্ত। তাঁদের এ প্রচেষ্টার অন্যতম উদাহরণ আমরা তাঁদের রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্যে দেখেছি। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সরকার পক্ষ থেকে যখন বলা হলো যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধের প্রস্তাব তাঁরা করেননি এবং তাঁরা রেডিও টেলিভিশনে কিছু-কিছু তা পরিবেশন করার পক্ষপাতী তখনও মুৎসুদ্দীর দল রবীন্দ্র-বিরোধিতায় বিভোর— 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'!

দশ

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হলো বিশিষ্ট মুসলমান কবি সাহিত্যিকদেরকে তৌহিদবাদ এবং ইসলামী তমদ্দুনের ধারক ও বাহক বলে প্রচার করা। মাইকেল রবীন্দ্রনাথকে একদিকে যেমন তাঁরা 'হিন্দু' শিল্পী সাহিত্যিক আখ্যা দিয়ে বাংলা সাহিত্যসং-স্কৃতির ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করছেন অন্যদিকে তেমনি নজরুল ইসলামকে মুসলমানী পোষাক পরিয়ে তাঁর সাহিত্যকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করতেও তাদের লজ্জা শরম নেই। নজরুল ইসলামকে যে কোনমতেই এই পোষাকে ভূষিত করা চলে না এ কথা আজ যাঁরা নজরুল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ তাঁরাও বিলক্ষণ জানেন। নজরুল যদি তাই হতেন তা হলে সামগ্রিক 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' সমাজে তিনি অপাঙক্তেয় থাকতেন না এবং হিন্দু সমাজে তাঁর এত সমাদরও সম্ভব হতো না। নজরুল জীবনের ঘটনাবলীর সাথে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই এ কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু শুধু নজরুল ইসলামই নন। যে কোন মুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিককেই আজ তারা সাম্প্রদায়িক পোষাক পরাতে উদ্যত। তাদের এই উদ্যোগ থেকে মনে হয় হয়তো কিছুদিন পর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদকে নতুন জন্মদানের জন্যে নিজেদের গর্ভে ধারণ করবেন!

এগারো

ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত মুসলমানরা একটি পৃথক আবাসভূমির দাবী করলেও সে দাবী সত্য অর্থে জাতীয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই তার জন্ম। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে দরকষাকষি এবং মনকষাকষির থেকেই হিন্দু-মুসলমানের একসাথে ঘর না করার সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা এই আর্থিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেরই সহচর। এ ছাড়া তার কোন নিজস্ব তাত্ত্বিক পরিচয় নেই। যে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। কারণ নির্দিষ্ট আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি ব্যতীত কোন সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্ভব হয় না। এজন্যেই ভারতীয়

হিন্দু-মুসলমানের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নানা আন্দোলন যে ভাবে গঠিত হয়েছে ঠিক সেইভাবে তাদের সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনও হয়েছে নিয়ন্ত্রিত।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কিন্তু দাবী করেন যে ভারতীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক গরমিল এবং বৈসাদৃশ্যের থেকেই মূলত পাকিস্তান আন্দোলনের সূত্রপাত। সমাজতত্ত্বের যে কোন যোগ্য ছাত্রই এ দাবীকে গাঁজা-খোরী বলে প্রতিপন্ন করবেন। কিন্তু এই গল্প গাঁজাখোরী হলেও আমাদের দেশের চিন্তায় তা এতো প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলো কেমন করে? প্রশ্নটিকে উপেক্ষা না করে তার যথাযোগ্য বিচার প্রয়োজন।

বারো

ইওরোপের বিভিন্ন দেশে আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের বর্তমান অবস্থার আলোচনা অনেকখানি সহজ এবং অর্থপূর্ণ হবে। ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান, স্প্যানিশ, রাশান, ইটালিয়ান ইত্যাদি আধুনিক ইওরোপীয় ভাষাগুলির উত্থান সেখানে ধনতন্ত্রের উন্মেষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রেনেসাঁস রিফরমেশন, শিল্পবিপ্লব অতিক্রম করে ইওরোপীয় জীবনে যে নতুন জাগরণের সূত্রপাত হলো জাতীয়তাবোধ ছিলো তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জাতীয় জাগরণ এবং ধনতন্ত্রের প্রয়োজনে নতুন চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করার জন্যে ল্যাটিন কোনক্রমেই আর উপযুক্ত বিবেচিত হলো না। রোমক সাম্রাজ্যের প্রতাপের যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের উত্থান পর্যন্ত ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ল্যাটিনই ছিলো প্রচলিত।

সে সময় বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশগুলির কথ্য ভাষা ভিন্ন-ভিন্ন হলেও উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা সে ভাষাগুলিতে কথা বলতেন না। লেখালেখির ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার তো ছিলো একেবারেই কল্পনাতীত। ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ফ্রান্সিস বেকনের পূর্বে কোন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ লেখকই গম্ভরীতিতে মাতৃভাষায় বিশেষ কিছুই লেখেননি। বেকন নিজেও তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ল্যাটিনে। সে পর্যন্ত ইওরোপের অপরাপর দেশগুলির মতো ইংলণ্ডেও ল্যাটিনের দোর্দণ্ড প্রতাপ অব্যাহত ছিলো।

ল্যাটিনের এই মর্যাদা ও প্রভাবের সবথেকে বড়ো কারণ ছিলো রোমান

ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব। ইওরোপে খ্রীস্টান চার্চ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোমের নেতৃত্বে রোমান ক্যাথলিক চার্চই ইওরোপের সর্বত্র রাজত্ব করতো। লুথারের সংস্কার আন্দোলন এবং পাল্টা চার্চ প্রতিষ্ঠার পর রোমান চার্চের আধিপত্য জর্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অনেক কমে আসে। এই প্রভাবহানির ফলে ল্যাটিন ভাষার মর্যাদাও সেইসব দেশগুলিতে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু শুধু ইংলণ্ড জর্মানীতেই নয়। ফ্রান্স স্পেন প্রভৃতি দেশ যেখানে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব তেমন বিনষ্ট হয়নি সেখানেও দেশীয় ভাষাসমূহের উত্থান ঘটলো। তার কারণ ল্যাটিন ছিলো অত্যন্ত প্রাচীনকালের ভাষা। তার কাঠামো যে সমাজের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলো আধুনিক ইওরোপীয়েরা তার থেকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে এ সময় পত্তন করেছিলো এক নতুন সমাজের। কাজেই ক্যাথলিক ধর্মে এবং সামন্ত ব্যবস্থায় ল্যাটিনের কার্যকারিতা যাই থাক নতুন অবস্থায় ইওরোপীয় দেশগুলির নতুন প্রয়োজন মেটাতে তা অক্ষম হলো।

তা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ল্যাটিন ছিলো ইওরোপীয় সমাজের উপরতলার ভাষা। সামন্ত যুগে ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে রাজকীয় কার্যনির্বাহ পর্যন্ত সবকিছু করতো উপরতলার লোকে। ল্যাটিন চর্চা তাদের মধ্যেই ছিলো সীমাবদ্ধ। শিল্পবিপ্লবের পর ইওরোপে যে নতুন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎপত্তি ও বিকাশ হলো তাদের সাথে সেই প্রাচীন ভাষার কোন সম্পর্কই ছিলো না। কাজেই সমাজে যেমনভাবে এই নতুন শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো তেমনিভাবে ক্রমশ তাদের ভাষাসমূহেরও উত্থান ঘটলো। এইভাবে ধীরে-ধীরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মানী প্রভৃতি দেশে ল্যাটিনের পরিবর্তে প্রবর্তিত হলো ইংরেজী ফরাসী এবং জর্মানের ব্যবহার।

জাতীয় ভাষার উত্থান ইওরোপীয় সমাজের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এলো যার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ। ল্যাটিন ভাষার বন্ধনে মানুষের চিন্তা ছিলো ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ। আধুনিক ভাষাসমূহকে অবলম্বন করে ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার ঘটলো ধর্মমুক্তি। এই ভাষাগুলিতে যে ধর্মচর্চা হলো না তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি নতুন প্রয়োজনের তাগিদে হলো নতুন চিন্তার বাহন। এই নতুন চিন্তাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলো আধুনিক ইওরোপের ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির।

কিন্তু ইওরোপের এই নতুন চিন্তা এবং সংস্কৃতি আকাশ থেকে খসে পড়লো না। দেশের মাটিতে নতুন আর্থিক ও সামাজিক জীবনের থেকেই সর্বাংশে তার উদ্ভব। ইওরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের সাথে এই সংস্কৃতির তাই মূলগত সম্পর্ক।

তেরো

ধনতন্ত্রের সূত্রপাত ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে ইওরোপ যেভাবে ধর্ম-সংস্কৃতির পর্যায় অতিক্রম করে সৃষ্টি করেছে এক ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক সংস্কৃতি ঠিক তেমনিভাবে বর্তমানে ধনতন্ত্রের প্রভাবে পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু অনুন্নত দেশেও শুরু হয়েছে এক নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনও আকাশ থেকে খসে পড়েনি। এর মূলও বর্তমানের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত।

বৃটিশ রাজত্বকালে ধনতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং এদেশে তার ক্রমশ. বিকাশের ফলে ভারতবর্ষেও বিভিন্ন জাতীয় ভাষার উদ্ভব ঘটে। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত ভাষা কথ্যভাষার পর্যায়ে ছিলো অথবা যাদের লিখিত ব্যবহার থাকলেও সম্ভ্রান্ত লেখকেরা তাকে পরিহার করে চলতেন সেগুলির চর্চা ও উন্নতি শুরু হলো। এভাবেই ভারতবর্ষে ফারসী সংস্কৃতের পরিবর্তে আরম্ভ হলো বাংলা, উর্দু, তেলেগু, মালায়লম, তামিল, গুজরাটি প্রভৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষসাধন। এই ভাষাগুলিকে অবলম্বন করেই গঠিত হলো বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট আধুনিক সংস্কৃতি।

ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক জটিলতার জন্যে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে অনেকখানি ব্যাহত করে। এইসময় সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে পরিণত হয় আর্থিক ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার শক্তিশালী হাতিয়ারে। এজন্যে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা একদিকে যেমন জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ব্যাহত হয় অন্যদিকে তার ধর্মমুক্তিও হয় বিলম্বিত। সাম্প্রদায়িকতার অবর্তমানে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন ইওরোপীয় জাতীয় আন্দোলনের মতো গঠিত হতে পারতো। সেক্ষেত্রে অখণ্ড ভারত অথবা পাকিস্তানের দাবীও হতো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সে পথে না গিয়ে অন্য পথ নিলো এবং তার ফলে ভারতবর্ষে সত্যিকার জাতীয়

আন্দোলনও স্থগিত থাকলো।

চোদ্দ

জাতীয়তার প্রশ্নকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকালে কংগ্রেস লীগ কোন দলই যথাযথভাবে বিচার করতে পারেনি। তার ফলে কংগ্রেস আওয়াজ তুললো অখণ্ড ভারতের এবং মুসলিম লীগ খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রচার করলো দ্বিজাতি তত্ত্ব। এর ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারত ও পাকিস্তানে জাতীয়তার প্রশ্ন শুধু জীবন্ত রইলো তাই নয়, নতুন শক্তি সঞ্চয় করে তা হলো প্রতাপশালী। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সাংস্কৃতিক অধিকার ইত্যাদির দাবী আসলে তাই উত্থানমুখী জাতীয়তার দাবী। এ দাবী পাকিস্তানে শুধু বাঙালীদের নয়—পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান, বেলুচ, সকল জাতীরই। কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থে আজ এ জাতীয়তার প্রবল বিরোধী।

পনেরো

পাকিস্তান আন্দোলনকালে বাঙালী কৃষকরা হিন্দু মহাজন জমিদারদের দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোষিত হতো। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রচারণার প্রভাবে তারা তাদের শোষককে জমিদার মহাজন হিসেবে না দেখে হিন্দু হিসেবে দেখেছিলো। তাদেরকে বোঝানো হয়েছিলো যে হিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা পেলে শোষণ বন্ধ হবে, কাজেই পাকিস্তানই তাদের একমাত্র পথ। পাকিস্তানের পর দেখা গেলো অত্যাচারীর শাসন-শোষণ বন্ধ নেই, উপরন্তু নতুন উদ্যমে তার আধিপত্য। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের গণতান্ত্রিক ও সুস্থ চেতনাকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও খর্ব করে এটাই হলো তার প্রামাণ্য উদাহরণ।

পাকিস্তানের বৃহৎ বুর্জোয়ারা এ উদাহরণ বিস্মৃত হয়নি। তাদের শোষণ-কার্যকালে এখানে তারা ঐ একইভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগাতে চায়। পাকিস্তান-পূর্ব অবস্থার সাথে পাকিস্তানোত্তর অবস্থার অবশ্য একটা গভীর প্রভেদ আছে। পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র সত্ত্বেও কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলনের মতো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন হিসেবে তারও কিছুটা গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিলো। কিন্তু বর্তমানের সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের সহায়কও নয়, তার পরাক্রান্ত শত্রু।

জাতীয়তা ভারত ও পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক না হলেও বৃহৎ বুর্জোয়া এবং তাদের মুৎসুদ্দীরা ঠিক সেই কথাটিই বলতে চান। তাঁদের মতে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যা-কিছু বৈশিষ্ট্য তাকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ না করলে রাষ্ট্রে নিরাপত্তা নেই। এ কথা যে কত মিথ্যা তা যে কোন সৎ ব্যক্তিই অন্যান্য অনেক দেশের, বিশেষত বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করবেন। এ সব রাষ্ট্রে জাতীয়তার কণ্ঠরোধ না করে বিভিন্ন জাতির যথাযথ বিকাশের ওপরই স্থাপিত হয়েছে তাদের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও নিরাপত্তার ভিত্তি।

কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বারা এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সংহতি স্থাপনের কোন সম্ভাবনা নেই। তার কারণ, এ কাজ করতে হলে শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং তাতে তারা নিতান্তই নারাজ। আঞ্চলিক শোষণ বৃহৎ বুর্জোয়া স্বার্থের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যচ্যুতি তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন করছে তারা এবং তাদের মুৎসুদ্দীর দল, অন্য পক্ষ নয়।

ভাষা ও বানান সংস্কারের রাজনীতি

ভাষা ও বানান সংস্কার নিয়ে এখন যে বিতর্ক চলছে সেটা নতুন নয়। পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের গোড়াতেই এ বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিলো। তা ছাড়া এর একটা পূর্ব ইতিহাসও আছে। কিন্তু সে পূর্ব ইতিহাসের সাথে পাকিস্তানোত্তর সংস্কার আন্দোলনের অনেক পার্থক্য। পূর্বে বানান সংস্কার প্রচেষ্টা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষিত মহলের একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কারের জন্যে সেকালে একটি কমিটিও নিয়োগ করেছিলো। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে এই সংস্কার প্রচেষ্টা সাংস্কৃতিক থেকে রাজনৈতিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এজন্যেই দেখা যায় যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর দাবী এবং বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তনের দাবী একই সময়ে এবং একই সূত্র থেকে উত্থিত।

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৪৭ সাল থেকেই বাংলা হরফ পরিবর্তনের আওয়াজ তোলেন। সে সময় ভাষার দাবীতে জনমত যথাযথভাবে গঠিত না হওয়ার ফলে ভাষার ক্ষেত্রে সরকারী বক্তব্য পরবর্তী-কালের থেকে অনেক বেশী বেপরোয়া ছিলো। সেজন্যে ফজলুর রহমান হরফ সংস্কারের কথা না বলে সোজাসুজি বাংলা ভাষা থেকে বাংলা হরফ বাদ দিয়ে আরবী হরফকে তার স্থলাভিষিক্ত করার প্রস্তাব করেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান যুক্তি ছিলো এই যে, বাংলা অক্ষর পুরোপুরি দেবনাগরী থেকে সৃষ্টি, কাজেই সে হরফ হিন্দুর। অর্থাৎ হিন্দু হরফ দিয়ে কোন মুসলমানী ভাষা সম্ভব নয়, কাজেই বাংলা ভাষার 'ধর্মান্তরে'র জন্যে তার হরফের ধর্ম পরিবর্তন অপরিহার্য।

শুধু আরবী হরফই নয়, কোন-কোন 'সংস্কারক' আবার 'অবৈজ্ঞানিক' বাংলা অক্ষর বাদ দিয়ে রোমান হরফ প্রবর্তনেরও সুপারিশ করেন। আরবী হরফ যেমন বাংলা ভাষাকে ইসলামী চরিত্র দান করবে, রোমান হরফ তেমনি নাকি বাংলা ভাষাকে দাঁড় করাবে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর।

'ইসলাম' এবং 'বিজ্ঞানে'র এই জয়যাত্রা কিন্তু ব্যাহত হলো। কারণ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মহলের প্রথম প্রস্তাব রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিরুদ্ধেই ১৯৪৮ সালে ছাত্র এবং শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট ও প্রভাবশালী অংশ রুখে দাঁড়ালো। শুরু হলো পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। এবং সেই আন্দোলনের তুফানে হরফ সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে কেউই আর মাথা ঘামালো না।

দুই

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর হরফের প্রশ্ন আবার তোলা হলো। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা সরকার মৌলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে যে ভাষা কমিটি নিয়োগ করেন সে কমিটির অন্যতম দায়িত্ব ছিলো হরফ সংস্কার প্রশ্ন বিবেচনা করে সরকারের কাছে উপযুক্ত সুপারিশ পেশ করা। উপরোক্ত কমিটি ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে তাঁদের রিপোর্ট পূর্ব বাংলা সরকারের কাছে দাখিল করেন। কিন্তু সরকার জনমতের কথা স্মরণ করে রিপোর্টটি অনির্দিষ্টকালের জন্যে চাপা দেন। পার্লামেন্টারী প্রথা উচ্ছেদের পর ১৯৫৮ সালে এই রিপোর্ট প্রথম প্রকাশিত হয়।

রিপোর্টটিতে কতকগুলি উদ্বেগ অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা যায় এবং সেই উদ্বেগের তাগিদে কমিটি কতকগুলি উদ্ভট সুপারিশ করেন। তাঁদের প্রথম ও প্রধান উদ্বেগ হলো বাংলা ভাষায় হিন্দু ও সংস্কৃত প্রভাব। এই প্রভাব উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে তাঁদের বিবিধরকম সুপারিশ যেমন—হিন্দুধর্ম, পুরাণ ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ ও বাক্যরীতি বর্জন এবং অসংস্কৃত ও ইসলামী ভাবধারা প্রচলন (উদাহরণ : 'আমি তোমায় জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না'র স্থলে 'আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না' ইত্যাদি)।

তাঁদের দ্বিতীয় উদ্বেগ বাংলা ভাষায় অসরলতা। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা ভাষা এতো কঠিন যে, সে ভাষায় কোন গুরুতর আলোচনা সাধারণ মানুষের পক্ষে কিছুতেই বোধগম্য হওয়ার উপায় নেই। কাজেই তার সরলীকরণ প্রয়োজন। এর জন্যে তাঁরা বাংলাকে সরল করে 'সহজ বাঙলা' নামে এক-ধরনের গদ্য রচনার প্রস্তাব করেন (উদাহরণ : 'মাসের পরিসমাপ্তিতে ঋণ শোধ করিব'র স্থলে 'মাস কাবারিতে দেনা বা করজ আদায় করিব')।*

* উদাহরণগুলি কমিটির রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

কমিটির তৃতীয় উদ্বেগ বাংলা হরফের অবৈজ্ঞানিক চরিত্র এবং অনুপ-যোগিতা। প্রথমত, এই হরফগুলির সংখ্যা এতো অধিক যে, টাইপ রাইটারে সেগুলির ব্যবহার এক দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, তা কোমলচিত্ত শিশু এবং সরলপ্রাণ জনসাধারণের শিক্ষার পক্ষে বাধাস্বরূপ। কাজেই তার জন্তে তাঁদের সুপারিশ বাংলা ভাষায় এবরাশি অক্ষরকে বর্জন করা।

উপরোক্ত তিনটি উদ্বেগ এবং তার থেকে উদ্ভূত তিনপ্রকার প্রস্তাবই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম প্রস্তাবটির মধ্যে যে ভাষাগত কোন যুক্তি নেই তা স্পষ্ট ! রাজনৈতিক উদ্বেগ থেকেই এই প্রস্তাবের সরাসরি উদ্ভব। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ‘জনসাধারণ’ চিরকালই অশিক্ষিত ‘সরলপ্রাণ’ জনসাধারণই থাকবে। তাদের শিক্ষাসংস্কৃতির মান কোনদিনই উন্নত হবে না। কাজেই তাদেরকে উন্নত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে শিক্ষাদীক্ষাকে তাদের বর্তমান বোধশক্তির আয়ত্তের মধ্যে এনে দাঁড় করাতে হবে। এ প্রস্তাবটির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রও সহজেই লক্ষণীয়। কমিটির তৃতীয় প্রস্তাব হরফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই একই প্রশ্ন। হরফের সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্তে টাইপ করতে অসুবিধা হয় কাজেই হরফ বদলাতে হবে। এ যুক্তি দেখে মনে হয় মানুষ যন্ত্র আবিষ্কার করেনি। যন্ত্র আকাশ থেকে পতিত হয়েছে এবং তার কোন পরিবর্তন অথবা উন্নতি সম্ভব নয়।

যন্ত্রকে আমাদের ভাষার উপযোগী করার পরিবর্তে আমাদের ভাষাকে যন্ত্রের উপযোগী করার সুপারিশকে বলা যেতে পারে অতি উন্মাদ অথবা অতিশয় দুর-ভিসন্ধিমূলক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চীনা এবং জাপানীরা এখনো তাদের ভাষায় কোন টাইপ রাইটার ব্যবহার করে না। কাজেই টাইপ রাইটার ছাড়া আমাদের উন্নতির কোন উপায় নেই এ আশঙ্কাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কমিটির তৃতীয় প্রস্তাবের আর-একটি কারণ এই যে, বাংলা হরফ কঠিন এবং অবৈজ্ঞানিক হওয়ার জন্তে শিশু এবং অধিক বয়স্ক জনসাধারণের পক্ষে সে বর্ণমালা আয়ত্ত করা খুবই দুঃসাধ্য। এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের শিশুরা এই অক্ষরগুলিই শিখে এসেছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পক্ষে সেটা সম্ভবও হয়েছে। বর্তমানে লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্বের মতো উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ার কারণ অক্ষর সমস্যা, এ কথা মনে করা চূড়ান্ত মূর্খতার পরিচায়ক। চীনাদের সাংকেতিক অক্ষরগুলি

আমাদের থেকে শতগুণ অবৈজ্ঞানিক হলেও জনশিক্ষা তাদের মধ্যে আমাদের থেকে দ্রুততরভাবে এবং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই কি কারণে, এদেশে শিক্ষা আজ সহজ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না সেটা বোঝার জন্যে হরফকে রেহাই দিয়ে সরকারী শিক্ষানীতি ও সমাজের সাধারণ অবস্থার দিকে নজর দিলেই সমস্যার আসল চেহারা চোখে পড়বে।

বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৫০ সালের ভাষা কমিটির সুপারিশের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। তবে রিপোর্টটিতে যে উদ্বেগগুলি ব্যক্ত এবং যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলি মৌলিক এবং তাদের জারিজুরি আজ পর্যন্ত অব্যাহত। এখানেই কমিটির সুপারিশগুলির গুরুত্ব।

যে সাহসের অভাবে ১৯৫০ সালে রিপোর্টটি সাধারণের সামনে প্রকাশ করা হয়নি, সেই সাহসের আবির্ভাবেই ১৯৫৮ সালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। সেই থেকেই ভাষা ও বানান সংস্কার আন্দোলনের নতুন সূত্রপাত।

তিন

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার মতো বাংলা ভাষারও বর্ণমালার কিছু সংস্কার যে প্রয়োজন, এ কথা এক হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। আগেই বলা হয়েছে যে দেশ বিভাগের পূর্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান ও হরফ সংস্কারের জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথ হরফ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা এবং ইচ্ছেমতো তার ব্যবহার করে গেছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে কোন সংস্কার-প্রস্তাবকেই কখনো কার্যকর করা হয়নি। সেটা না করার কারণ উপযুক্ত আর্থিক, সামাজিক ও কারিগরী উন্নতির অভাব। সোজা কথায় বলতে গেলে অতো বড়ো একটা পরিবর্তন সাধন করার জন্যে যে সাধারণ প্রস্তুতির প্রয়োজন, তৎকালীন সমাজের তা ছিলো না।

কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজের কি তা আছে? আজকের ভাষা সংস্কারের বিতর্কে এটাই হলো সবথেকে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর আলোচনার জন্যে প্রশ্নটিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা দরকার। প্রথমত, দেখতে হবে যে, আমরা আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির এমন পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছি কিনা, যখন হরফ সংস্কার ব্যতীত আমাদের উন্নতির আর কোন সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, আমরা বর্তমান পর্যায়ে যদি এ ধরনের কোন সংস্কার করতে

উদ্যোগী হই, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার কী প্রভাব পড়বে। তৃতীয়ত, বর্তমান পর্যায়ে এ সব প্রস্তাবকে সার্থকভাবে যদি কার্যকর করা না হয়, তা হলে তার ফলে সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে হতবুদ্ধিতা এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে তার মুনাফাভোগী কে হবে। এই তিনটি প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমেই আমরা বর্তমান ভাষা ও বানান সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

চার

প্রথম প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে হবে উন্নতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হয়েছি। সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, পূর্ব পাকিস্তানী লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে কিছুটা নতুন উৎসাহ-উদ্যম সত্ত্বেও বিগত একুশ বছরে এখানে সাহিত্যের উন্নতি তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। কথাসাহিত্যের সাধারণ দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করলে এ কথা বোঝার সুবিধা হবে। কিন্তু শুধু কথাসাহিত্য কেন, সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন এলাকাতেই এমন উন্নতি সাধিত হয়নি, যার ফলে এ কথা বলা চলে যে, হরফ সংস্কার আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে হরফকে নিয়ে রবিঠাকুর, নজরুল ইসলাম সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে পেরেছেন এবং আজও বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা ঘর করছেন, তাকে ঘরছাড়া করার কোন সত্যিকার প্রয়োজনই বস্তুতপক্ষে আমাদের সমাজে এখনো পর্যন্ত অনুভূত হয়নি। এমন কোন্ লেখক আমাদের দেশে আছেন যিনি দাবী করতে পারেন যে, তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা বাংলা হরফের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে? এই দাবী কেউ করলে বানান সংস্কার আন্দোলনের পাণ্ডারা নিজেরাই তাঁকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করবেন। কারণ হরফ সম্পর্কে এই অভিযোগ সত্যিই হাস্যকর।

ব্যবসা-বাণিজ্য আর্থিক জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা হরফ উন্নতির পক্ষে বর্তমানে বাধাস্বরূপ, এ বক্তব্যেরও কোন ভিত্তি নেই। প্রথমত, অক্ষর বাধাস্বরূপ হয়তো হতে পারে তখনই যখন আমরা আমাদের সমস্ত কাজকর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন করবো। প্রথম ধাপ সেটাই। কিন্তু বাংলা ভাষার এ ধরনের ব্যবহারই যেখানে নেই, সেখানে বাংলা অক্ষর উন্নতির প্রতিবন্ধক হয় কোন্ হিসেবে? টাইপ রাইটারের উল্লেখ করে বলা হয় যে সংখ্যাধিক্যের কারণে

বাংলা অক্ষরগুলি টাইপ রাইটারের পক্ষে অনুপযোগী। উপযোগিতার প্রশ্ন বাদ দিয়ে এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা টাইপ রাইটারের সংখ্যা কত? খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে তাদের সংখ্যা দুই-এক ডজনের বেশী নয়। সমগ্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সংখ্যা মাত্র দুই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিসের কাজকর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার কতখানি হচ্ছে তা সহজেই অনুমান করা চলে। কাজেই ভাষার ব্যবহারই যেখানে নেই, সেখানে বাংলা অক্ষর উন্নতির প্রতিবন্ধক, এ কথা বলার উদ্দেশ্য কী?

বাংলার ব্যবহার যে উচিতমতো হচ্ছে না, এমনকি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও আজ পর্যন্ত বাংলাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না, তার বিশেষ কতকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আর্থিক জীবনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধন করার উপযুক্ত অবস্থার অভাব। বাংলাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করতে হলে তার জন্যে প্রয়োজন উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ব্যবহৃত বইপত্রগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করা এবং নতুন পুস্তক প্রণয়ন করা। আমাদের শিক্ষিত মহলের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সর্বোপরি দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন নয়, যাতে করে আমরা এ কাজ এখন সম্পন্ন করতে পারি। তার জন্যে যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন তারও আজ নিতান্ত অভাব। এজন্যেই দেখা যায় যে, নিম্নপর্যায়ে, এমনকি বি. এ ক্লাস পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করে এসেও ছাত্রেরা পাঠ্য বিষয়-বস্তুর সাথে তেমনভাবে পরিচিত হয় না। এর কারণ এই যে বাংলা ভাষাতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই খুব কম এবং যা আছে তারও মান নিতান্ত নিচু। এর ফলে ছাত্রেরা এম. এ. পড়তে এলেও তাদেরকে পড়ানোর বিশেষ-কিছু থাকে না। তাদের বোধশক্তি স্তিমিত হয়ে আসে এবং তারা মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করে। এর দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা তো হয়ই না, উপরন্তু এই অর্ধশিক্ষিত যুবকরাই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে শিক্ষার মানকে ক্রমাগত নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষার এই সমস্যার সাথে পাঠ্যতালিকার সমস্যাও জড়িত। অতি অল্প বয়স থেকে ছাত্রদের ঘাড়ে এখন যে অসংখ্য পাঠ্যবিষয় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ অথবা জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি, কোনটাই হচ্ছে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদেরকে যদি

পৌরনীতি, বিজ্ঞান, দীনিয়াত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পড়তে বাধ্য করা হয়, তা হলে তাদের পক্ষে ভাষা ও গণিত শিক্ষা উপযুক্তভাবে সম্ভব হয় না। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে এই দুইয়ের গুরুত্বই সর্বাধিক। ভাষা যদি কোন ছাত্র ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে, তা হলে দুই তিন ক্লাস ওপরে উঠে উপরোক্ত বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে তার বিশেষ কষ্ট অথবা অসুবিধা হয় না। কিন্তু নিচের ক্লাসে অন্যান্য বিষয় পাঠের চাপে ভাষা অথবা গণিত শিক্ষা তাদের দ্বারা ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না। এর ফলে তারা ওপর দিকে গিয়ে কলা অথবা বিজ্ঞান, কোন ক্ষেত্রেই যতটুকু বোঝা দরকার তা বুঝতে পারে না। ভাষা ও গণিত বিদ্যার দৈন্যের ফলে তারা অন্যান্য বিষয় আয়ত্ত করতে অক্ষম হয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যখন এই অবস্থা, তখন অক্ষর নিয়ে এত চেঁচামেচির স্থান কোথায়? শিক্ষার নিম্ন স্তরে এবং তার ফলে অন্যান্য স্তরে যে নৈরাজ্য আজ বিরাজ করছে তার জন্যে দায়ী কি বাংলা হরফ, না উপরোক্ত কারণসমূহ?

পাঁচ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা ভাষা থেকে যদি এখন ঙ, ঈ, ী, ঊ, ঋ, ৃ, ে, ঐ, ৈ, ঔ, ঞ, জ্ঞ, ক্ষ, এবং এই ধরনের আরও অনেক অক্ষর বাদ দেওয়া যায় তা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেটা দেখা দরকার।

প্রথম কথা হলো আর্থিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অসুবিধার দরুন পুরাতন বই-পুস্তকগুলিকে নতুন অক্ষরে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। এর ফল দাঁড়াবে এই যে, সরকারী প্রকাশনালয় এবং সরকারী নির্দেশে কতগুলি বেসরকারী প্রকাশনালয় থেকে অক্ষরান্তরিত হয়ে যে পুরাতন বইগুলি প্রকাশিত হবে, সেগুলির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য এবং তাদের নির্বাচনও হবে উপরোক্ত প্রকাশকদের দ্বারা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত। কাজেই যে স্বল্পসংখ্যক বইপত্র নতুন অক্ষরে প্রকাশিত হবে, সেগুলির চরিত্রের ওপর অন্য কারো হাত থাকবে না এবং ছাত্র ও সাধারণ পাঠককে প্রকাশকদের নির্দেশিত গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হবে। কাজেই বর্তমানে ভালো ইংরাজী না জানার ফলে ছাত্রদের শিক্ষার পরিধি যেভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে সেইভাবে পুরাতন

অক্ষরগুলির সাথে পরিচয়ের অভাবে ছাত্রদের শিক্ষার পরিধি আরও সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। বস্তুত পূর্ব-প্রচলিত হরফে লেখা বাংলা বইপত্র হবে প্রায় বিদেশী ভাষায় লেখা বইয়ের মতোই দুর্বোধ্য। কেউ যদি বলেন যে, আপাতত এই দুই বর্ণমালাই কিছুকাল আয়ত্ত করতে হবে, তা হলে তিনি তার দ্বারা 'কোমলমতি' ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার থেকে অসুবিধাই সৃষ্টি করবেন বেশী।

আর্থিক অভাব ও অন্যান্য কারণে অন্য ভাষা থেকে যখন বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজকে ত্বরান্বিত করাই সম্ভব হচ্ছে না, তখন বাংলা থেকে বাংলায় অক্ষরান্তরণ কাজে এই পর্যায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা উন্মত্ততা অথবা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চক্রান্ত ব্যতীত আর কী?

ছয়

উপরোক্ত অসুবিধাগুলির জন্যে গণচীনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও লিপি সংস্কারের কাজে হাত দিতে তারা এখনো সক্ষম হয়নি। অথচ তাদের সমস্যা যে আমাদের থেকে অনেক বেশী দুরূহ, এ কথা সকলেই জানে। গণচীনে যে কারণে এ জাতীয় সংস্কারকার্যে হাত দেওয়া হয়নি, ঠিক সেই কারণের প্রতি লক্ষ রেখেই পাকিস্তানে অন্যান্য ভাষা বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার বানান-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত। এ কথা যত শীঘ্র এবং যত ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

বর্তমানে আমাদের দেশে শুধু যে অক্ষর সংস্কারের প্রয়োজন আছে তাই নয়, এদেশে আজ প্রয়োজন জীবনযাপনের ভিত্তিকেই আমূলভাবে পরিবর্তন করা। তার জন্যে যে প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং স্বচ্ছদৃষ্টি প্রয়োজন তার কোন অস্তিত্ব এখন নেই। যে দেশে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসগৃহের সমস্যা আজ অধিকাংশ মানুষকে বিপর্যস্ত করছে, সেখানে বর্ণমালা-সংস্কার আন্দোলন কোন্ অর্থে বাস্তব এবং প্রয়োজনীয়? যে কোন দেশেই সমস্যার অভাব থাকে না; কিন্তু সব সমস্যার গুরুত্ব এবং তাগিদ এক হয় না। কাজেই গুরুত্ব ও তাগিদ অনুসারে প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা দরকার। শুধু তাই নয়। এমনভাবে একে-একে সমস্যাগুলির সমাধান প্রয়োজন যাতে করে পরবর্তী সমস্যা সমাধানের পক্ষে পূর্ব সমাধান সহায়ক হয়। এজন্যেই চীনারা প্রথমে অসুবিধাজনক চিত্রলিপির ক্ষেত্রে তাদের শক্তি ক্ষয় না করে সে সমস্যাকে

আপাতত ইচ্ছাকৃতভাবে টিঁকিয়ে রেখেছে। নিজেদের আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার পরই তারা এ কাজে হাত লাগাতে সক্ষম হবে এবং তখন তারা অন্যান্য কাজের মতো লিপি পরিবর্তনও সুসম্পন্ন করবে।

কিন্তু আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। চীনারা যেখানে চিত্র-লিপির সংস্কার তাদের উন্নতির পক্ষে বর্তমান পর্যায়ের বাধাস্বরূপ বলে সে কাজ স্থগিত রেখেছে, আমরা সেখানে কল্পিত বর্ণমালা সমস্যা সমাধানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। বর্তমান পর্যায়ে ওটা যে সত্যি অর্থে আমাদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই নয়, এ কথাও অনেকে বিবেচনা করার অবসর পাচ্ছেন না। আমাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করা দূরের কথা, অক্ষর সংস্কার করে তাদের উন্নতিকে বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টাতেই বস্তুত তাঁরা ব্যাপৃত আছেন। সোজা কথায় বলতে গেলে, বর্ণমালা-সংস্কার আজকে আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনের মধ্যে যে বিপর্যয় ঘটাবে, তার ফলে আমরা নিদারুণভাবে পিছিয়ে থাকবো। প্রথমত, শিক্ষার মান এবং কাঠামো ভেঙে পড়বে এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিক্ষেত্রে তার প্রভাব এড়ানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, এই হঠকারী কার্যক্রমের দ্বারা সমাজের সর্বস্তরের চিন্তাক্ষেত্রে এমন হতবুদ্ধিতা এবং নৈরাজ্য দেখা দেবে, যার ফলে কোন ক্ষেত্রেই সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ এদেশের লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যেই প্রকৃতপক্ষে অক্ষর-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত।

সাত

১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা এবং সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ একদিনের জন্যেও স্থগিত থাকেনি। এ আক্রমণের বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন হলেও তার সত্যিকার চরিত্র অপরিবর্তিত আছে। শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় চেতনার (যে চেতনা কোন অর্থেই রাষ্ট্রবিরোধী নয়) উন্মেষ ভাষাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত গড়ে উঠেছে। এর ফলে তাদের সমগ্র জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। এ পরিবর্তন আর্থিক জীবনক্ষেত্রেও সহজেই লক্ষণীয়। কিন্তু জাতীয় জীবনে পরিবর্তনের এই প্রেরণা পাকিস্তানের বৃহৎ বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপন্থী; কংগ্রেসের অন্তর্গত হিন্দু বুর্জোয়ারা যেভাবে

ভারতের অখণ্ডতার আওয়াজ তুলে অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর সাথে-সাথে তাদের জাতভাই মুসলমান বুর্জোয়াদেরকেও দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলো, সেইভাবে পাকিস্তানের বৃহৎ বুর্জোয়ারা এখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ইত্যাদির আওয়াজ তুলে যে কোন প্রকার জাতীয় আন্দোলনকে বাধা দান করতে বদ্ধপরিকর। অক্ষর-সংস্কার আন্দোলন বৃহৎ বুর্জোয়াদের সেই চক্রান্তরই অন্যতম অংশ।

এই চক্রান্তের মধ্যে অক্ষর-সংস্কার আন্দোলনের সকল সমর্থকরাই জ্ঞানত অংশ নিচ্ছেন এমন নয়। কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সেটা হয় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এ জাতীয় প্ররোচনা এবং প্রচারণার উৎপত্তি হয়। তারপর অন্যান্য অনেকে সংস্কার অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থের বশে তাতে যোগদান করে পরোক্ষভাবে সেই চক্রান্তে শরিক হন। ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্যটিই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

বৃহৎ বুর্জোয়া স্বার্থ যেভাবে বিগত একুশ বছরে পূর্ব বাংলায় ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ চালিয়ে এসেছে, ঠিক সেইভাবেই এখনো তারা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান অক্ষর-সংস্কার আন্দোলনও পূর্বের মতোই বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের প্ররোচনা এবং প্রচারণা থেকেই উদ্ভূত। এতে যাঁরা সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ তাঁদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক মানুষ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করছেন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের যে সব 'সংস্কৃতিসেবীরা' এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন, তাঁদের অধিকাংশই এদেশে বৃহৎ বুর্জোয়া স্বার্থ উদ্ধারে ব্যাপৃত। এঁরা হলেন প্রকৃতপক্ষে তাদেরই সাংস্কৃতিক মুৎসুদ্দী।

ছাত্র, জনসাধারণ এবং শিক্ষিত মহলের এ কথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, বর্তমানের অক্ষর পরিবর্তন ও ভাষা-সংস্কার আন্দোলন আমাদের আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর এক মস্ত হামলাস্বরূপ। এবং প্রতিটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরই আজ কর্তব্য বৃহৎ বুর্জোয়ার এই হামলাকে প্রতিহত করে এদেশে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক জীবন-গঠন কার্যে সচেষ্ট হওয়া।

একুশে ফেব্রুয়ারী

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হলো তার স্বতঃস্ফূর্ততা। একটু ভালোভাবে আন্দোলনের গতিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এই বিস্ময়কর স্বতঃস্ফূর্ততা যেন আন্দোলনকে প্রবল প্রতাপে এগিয়ে নিচ্ছে। সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে অবশ্যই আছে কিন্তু সেটা মুখ্য নয়। আন্দোলনের তীব্রতা ব্যাপকতা এবং সাফল্য তাদের কাছেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এই স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেই তার সত্য চরিত্রের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু শুধুমাত্র পুলিসী জুলুম অথবা ছাত্র-হত্যার দ্বারা এই স্বতঃস্ফূর্ততার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ জাতীয় পুলিসী জুলুম এবং ছাত্র-নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানে নতুন ছিলো না। ১৯৫০ সালে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দীদের ওপর মুসলিম লীগের পুলিস গুলি চালায় এবং তার ফলে বেশ কিছুসংখ্যক দেশপ্রেমিক হতাহত হন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়কার গুলিচালনা থেকেও রাজশাহী কারাগারের হত্যাকাণ্ড অনেক বেশী নৃশংস এবং বর্বরোচিত। কিন্তু তার জন্যে সে সময় দেশব্যাপী কোন আন্দোলন তো দূরের কথা, তেমন কোন ছোটখাটো সংগঠিত বিক্ষোভও ঘটেনি। নাচোলের কৃষক আন্দোলনের সময় ইলা মিত্রের ওপর পূর্ব পাকিস্তানী সরকারের পুলিস নির্মম অত্যাচার করেছে। কিন্তু তার জন্যে এদেশের অন্যান্য স্থানের কৃষক শ্রমিক-মধ্যবিত্ত জনসাধারণ তেমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়নি। এমনকি ১৯৪৮ সালেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ঢাকা শহরে বাংলা ভাষার সমর্থকদের ওপর পুলিস নানাভাবে যে নির্যাতন করেছিলো তারও বিশেষ কোন প্রতিবাদ হয়নি। শুধু তাই নয়। ঢাকার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ সে সময় বাংলা ভাষা এবং তার সমর্থক ছাত্র জনতার সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

এ কথা যদি সত্যি হয় তা হলে দেখা দরকার ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট

এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এ দেশে এমন কী ঘটলো যার ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন লাভ করলো এতখানি ব্যাপকতা ও সাফল্য ?

এই মধ্যবর্তী সময়ে যা ঘটলো তাকে এক কথায় বর্ণনা করলে বলতে হয় যে ভাষার প্রশ্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হলো রাজনৈতিক আন্দোলনে। স্বাধীনতার পূর্বে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের যে স্বর্গীয় চিত্র অঙ্কন করেছিলো তার চরিত্র এবং স্বরূপ অচিরেই জনগণের সামনে রূঢ়ভাবে উদ্‌ঘাটিত হলো। শোষণ-শাসন এবং অন্যান্য দুষ্কৃতির অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া পূর্ব বাংলার মানুষকে করে তুললো ক্রমশ অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ। নিজ দেশে তারা যেন হলো পরবাসী।

এতখানি শঠতা, শোষণ ও প্রবঞ্চনায় তাদের সহ্যসীমা লঙ্ঘিত হওয়ার উপক্রম হলো। এমনসময় এলো প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা। এ ঘোষণা ছাত্র-জনসাধারণের কাছে শুধু রাষ্ট্রভাষার ঘোষণারূপেই প্রতিভাত হলো না। এ ঘোষণার মধ্যে তারা দেখলো শোষণ, তারা দেখলো প্রভুত্ব এবং তাদের স্বদেশকে বিদেশ করার ষড়যন্ত্র। এই চেতনা পূর্ব বাংলার বারুদসদৃশ রাজনৈতিক জীবনে অগ্নিসঞ্চার করলো। শুরু হলো ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। এবং এ আন্দোলন এবার শুধু স্বল্পসংখ্যক ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পরিণত হলো জনগণের গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনে।

গোর্কী জন্মশতবার্ষিকী

ম্যাক্সিম গোর্কীর মতো সাহিত্যপ্রতিভা পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে একদিক দিয়ে তিনি সর্বপ্রথম ব্যতিক্রম এবং সেই হিসেবে এক নতুন ধারার প্রবর্তক। শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কলাকৈবল্যবাদ নামে যে শঠতা প্রচলিত আছে তার প্রধান কথা হলো শিল্পী-সাহিত্যিক ও অন্যান্য সংস্কৃতিসেবীরা সমাজের মধ্যে বসবাস করলেও তাদের সাধনা ও সৃষ্টির সাথে সমাজের কোন প্রয়োজনীয় সংযোগ নেই। অর্থাৎ সৃষ্টিকালে শিল্পী আকাশবিহারী হন এবং এমন এক কল্পলোকে বিচরণ করেন, যেখানে মানবিক ও সামাজিক সমস্যার তেমন কোন স্থান নেই। এই শিল্পদর্শন অনুসারে সৃষ্টিকালে শিল্পীর পক্ষে সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে নিজের প্রতিভাকে পীড়িত করা অথবা আমাদের পক্ষে শিল্পীকে তাঁর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া, এ দুই-ই শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিল্পের উন্নতি না হয়ে তার অপমৃত্যু ঘটে। কাজেই শিল্পীদের প্রতি তাঁদের নির্দেশ, 'কলাকে কৈবল্য জ্ঞান করে শিল্প সৃষ্টি করো।'

এই বুর্জোয়া শিল্পাদর্শকে সচেতনভাবে অমান্য ও লঙ্ঘন করেই গোর্কী-সাহিত্যের সৃষ্টি। সাহিত্য অথবা শিল্পচর্চা গোর্কীর কাছে অবসরক্লান্ত মানুষের বিলাসিতা নয়। তাঁর কাছে এ হলো মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্চারই একটি বিশেষ অঙ্গ।

এইজন্যে বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রের আন্দোলন ও গতি থেকে সাহিত্যিক শিল্পী হিসেবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। তাই সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য বলে আসলে কিছু নেই। এমনকি কলাকৈবল্যবাদের নামে যে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা হয় সে সাহিত্যও সমাজের ঊর্ধ্বে ওঠে না। উপরন্তু সমাজেরই এক বিশেষ শ্রেণীর জীবনযাত্রাকে নানাভাবে টিঁকিয়ে রাখতে যত্নশীল হয়।

সমাজের সাথে সাহিত্যের সংযোগের কথা গোর্কীর আগে কোন শিল্পী

উপলব্ধি করেননি তা নয়। অনেকেরই মধ্যে সে উপলব্ধি এসেছে এবং তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে নানা সামাজিক সমস্যার চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। গোর্কীর সাথে তাঁদের পার্থক্য এই যে, অন্যান্যদের থেকে সমাজ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি এবং চরিত্র অনেকখানি স্বতন্ত্র। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের আসল বুনিয়াদ যে সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা, তার উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি, এ বোধ গোর্কীর পূর্বে অন্য কোন সাহিত্যিকের সার্থকভাবে ছিলো না। গোর্কী-সাহিত্যের সমাজমুখিতা তাই শুধু তাঁর সংবেদনশীলতা থেকে জন্মলাভ করেনি। সমাজ-চরিত্রের উপলব্ধিই তার সত্যিকার জনক।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামে মানব-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এর একদিকে তারা, যারা উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে এবং অবসরযাপনের জন্যে নানা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে এবং অন্যদিকে থাকে তারা, যারা নিজেদের শ্রমশক্তির দ্বারা গড়ে তোলে ধনিকশ্রেণীর নিশ্চিত জীবন ও সভ্যতার বিবিধ উপকরণ, যারা শোষিত হয়, যাদের অবসর বলতে কিছু নেই।

গোর্কী নিজে এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং সমাজকে শোষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁর সাহিত্যসাধনা। কিন্তু তিনি করুণার বশে এ কাজ করেননি। কারণ, করুণার বশবর্তী হয়ে কিছু করা অথবা করুণা গ্রহণ করা, এ দুই-ই মানবচরিত্রকে কলুষিত করে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ককে উন্নত না করে তার অবনতি ঘটায়। এজন্যে তাঁর সাহিত্যে করুণা নেই, নেই অক্ষম অশ্রুপাত। নিজের সাহিত্যসাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষের মনে সঞ্চার করতে চেয়েছেন চেতনা ও শক্তি, যার মহিমায় তারা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করে চোখের পানি ফেলবে না, সে অবস্থাকে চিরন্তন মনে করে বসে থাকবে না। তারা উপলব্ধি করবে যে, মানুষের মধ্যে শোষণ-শাসনের সম্পর্ক সর্বাংশে পরিবর্তন-সাপেক্ষ এবং সে পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত জ্ঞান, চেতনা এবং দুর্বার সাহস। সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের দায়িত্ব তিনি নিজে সম্পন্ন করেছিলেন, শুধু সেজন্যে নয়, অন্যদেরকেও সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতন এবং উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন বলেই গোর্কী-সাহিত্যের এত গুরুত্ব। এজন্যেই তিনি সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা।

অক্টোবর বিপ্লব ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

১৯১৭ সালের অক্টোবরে রুশদেশে যে বিপ্লব ঘটে তার সাথে পূর্ববর্তী যে কোন বিপ্লব, এমনকি ফরাসী বিপ্লবেরও দুস্তর পার্থক্য। ফরাসী বিপ্লবের পর সামন্ত-তন্ত্রের পতন ঘটলেও তার মাধ্যমে সমাজদেহে শোষণের উচ্ছেদ হয়নি। শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়, ফরাসী বিপ্লব ছিল তারই পরিণতি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং উৎপাদন পদ্ধতিকে বাতিল করে ফরাসীদেশে এর পর শুরু হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়যাত্রা। এ যাত্রা-পথে উৎপাদন ক্রমবর্ধিতভাবে সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করলেও তার দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তাই নয়। সে ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বণ্টনের মধ্যে একটা ব্যবধান প্রথম থেকেই ছিলো এবং সে ব্যবধান ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়ে বৃদ্ধি-লাভ করতে থাকলো। এর ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন একটা দৃঢ় সামাজিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত হলেও বণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্য দূর হলো না। কাজেই শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত লোকেরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকলেও তারা আর্থিক এবং সামাজিক অধিকার থেকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত হয়ে রইলো। অক্টোবর বিপ্লব বাস্তবপক্ষে সর্বপ্রথম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদন এবং বণ্টনের মধ্যেকার এই ব্যবধানকে নিশ্চিহ্ন করার পথনির্দেশ করে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে স্থাপন করলো এক সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তির ওপর। এই নতুন ভিত্তি রচনার মধ্যেই তাই অক্টোবর বিপ্লবের সত্যিকার তাৎপর্য নিহিত আছে।

সমাজের সামগ্রিক জীবনকে শোষণমুক্ত করার জন্যে অনেক বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। সেগুলিকে কার্যকর করতে হলে বণ্টনক্ষেত্রে অসাম্য এবং শ্রেণী শোষণের উচ্ছেদসাধন একান্ত অপরিহার্য। এ কাজ রাতারাতি রুশ-দেশে সম্ভব হয়নি এবং তা হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু তবু একে সম্ভব করার

জন্যে প্রথম থেকেই তারা সচেতন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সঞ্চার করে এক অভূতপূর্ব জাগরণের। জনসাধারণের জীবনে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাফল্যের ওপরই যে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য প্রায় সর্বতোভাবে নির্ভরশীল এ সত্য লেনিন এবং অপরাপর নেতৃবৃন্দ সহজেই উপলব্ধি করেন এবং সেই পথ ধরে অগ্রবর্তী হন।

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন শোষণমূলক আর্থিক ব্যবস্থার দ্বারা পরিপুষ্ট হতো। তার ফলে শুধু উচ্চশ্রেণীর নয়, নিম্নশ্রেণীর শোষিত মানুষদের মনেও এমন সব ধ্যানধারণা ও সংস্কার রাজত্ব করতো, যেগুলি প্রচলিত শোষণ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার পক্ষে হতো যথেষ্ট সহায়ক। নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্যে শোষকশ্রেণীর লোকেরা বহু মিথ্যার জন্ম দিতো এবং সেই সব মিথ্যাকে আশ্রয় করে সমাজের উচ্চনীচ সকলেই নির্বাহ করতো জীবনযাত্রা। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের শুরুতে এই মিথ্যার মহিমাতেই পাদ্রী গ্যাপনের নেতৃত্বে অগণিত মানুষ শোষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলো জার নিকোলাসের কাছে। তাদের ধারণা ছিলো জারের অধীনস্থ লোকেরা অত্যাচারী হলেও জার নিজে একজন মহানুভব ব্যক্তি, তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করলে অবিচারের একটা প্রতিকার হবেই। কাজেই গলায় ক্রুশচিহ্ন ঝুলিয়ে, ধর্মভাবে আপ্লুত হয়ে, তারা ধর্মাবতার জার নিকোলাসের প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলো। সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শোষকশ্রেণীর মধ্যমণি নিকোলাসের হৃদয় প্রজাদের আবেদন-নিবেদনে আর্দ্র হলো না। উপরন্তু জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্যে তাদের উপর নির্দয়ভাবে গুলিবর্ষণের ফলে কয়েক হাজার মানুষ নিহত এবং আহত হলো। আর্থিক জীবনের তাগিদে শোষণকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে মানুষের মনে একটা সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারিত হলেও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রভাবে মানুষ যে নিজেকে কতখানি বিপন্ন করতে পারে ১৯০৫ সালের এই ঘটনাই সে কথা প্রমাণ করে। কিন্তু শুধু এটাই নয়, আরও অসংখ্য ধ্যান-ধারণা যুগ-যুগ ধরে শোষিত মানুষের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে, যেগুলির উচ্ছেদ বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে অপরিহার্য এবং এখানেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্ব।

সংস্কৃতির ধর্মচরিত্র, দেশচরিত্র ইত্যাদি নিয়ে আকাশ-পাতাল গবেষণা করলেও তার শ্রেণীচরিত্রের আলোচনা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মধ্যে তেমন দেখা

যায় না। তাঁরা যে বিশেষ এক শ্রেণীর প্রতিনিধি, এ কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না এবং এজন্যেই নিজেদের সংস্কৃতিকে সমগ্র সমাজের সংস্কৃতি বলে প্রচার করেন। এই প্রচারণার মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া মূল্যবোধ, ভালোমন্দের জ্ঞান, ইত্যাদিকে তাঁরা সমগ্র সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলে প্রমাণ করতে চান। এ জাতীয় সংস্কারের ফলেই এদেশে উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও বিধবা হিন্দু যুবতীরা অনেকে স্বর্গারোহণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বেচ্ছায় চিতায় অরোহণ করতো এবং এখনো শোষিত প্রজারা শোষক জমিদার-মহাজনকে পিতামাতা জ্ঞান করে অনেক সময় স্বেচ্ছায় তাদের দাসত্ব করে এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে সম্মত হয় না। এই প্রচারণার ফলেই হিন্দু-শ্রমিক মুসলমান-শ্রমিক নিজেদের শ্রমিকচরিত্র বিস্মৃত হয়ে পরস্পরের প্রাণনাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এর ফলেই বাঙালী, অবাঙালী শ্রমিকেরা প্রবৃত্ত হয় পরস্পরের সাথে দাঙ্গা করতে।

প্রত্যেকটি সংস্কারের যেমন একটি বাস্তব ভিত্তি থাকে অর্থাৎ বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে সেটি মানুষের মনে ধীরে-ধীরে নিজের রাজত্ব কায়েম করে তেমনি এ কথাও সত্য যে সেই বাস্তব ভিত্তির অবসানের সাথেই সংস্কারগুলির রাজত্ব রাতারাতি বিলুপ্ত হয় না। তার জন্যে সময় লাগে এবং সে সময়কে সংক্ষেপ করার জন্যে প্রয়োজন হয় কিছুটা সজ্ঞান প্রচেষ্টার। এ প্রচেষ্টাকে জাগ্রত রাখার জন্যেই অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েট রাশিয়ায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং তার ফলেই সে দেশে সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া মূল্য-বোধের অবসান ঘটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং মূল্যবোধ। এজন্যেই লাল চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাদের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার জন্যে আজ অপরিহার্য।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ঐতিহাসিক পটভূমি

মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থা ছিলো ভূমিনির্ভর। সেকালে জমির মালিকানা স্বত্ব অথবা তার উপর কর্তৃত্বের ভিত্তিতেই মানুষের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের সমৃদ্ধি মর্যাদা নির্ণীত হতো। ভূমিনির্ভর এই ব্যবস্থার নামই সামন্ততন্ত্র। সে ব্যবস্থায় আর্থিক সমৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজাই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। অন্য পক্ষে, সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ অধমস্থানীয় ছিলেন ভূমিদাসেরা, যাঁরা নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা ধন উৎপাদন করলেও তাতে তাঁদের নিজেদের কোন অধিকার থাকতো না, যাঁরা ছিলেন পুরোপুরি নিঃস্ব, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদাহীন। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ছিলো সমাজের অবশিষ্ট অংশ।

আর্থিক জীবনের যারা নিয়ন্ত্রেতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ প্রধানত তাদের হাতেই থাকে। সামাজিক সম্পর্কের অলঙ্ঘনীয় নিয়মেই মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো তাদেরই হাতে, যারা ছিলো জমির মালিক। সে ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি দেশ এক-একটি জমিদারীর মতো শাসিত হতো। এই জমিদারীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকতেন রাজা এবং তাঁর অধীনস্থ বহুসংখ্যক সামন্ত ভূম্যধিকারী সমগ্র দেশের উৎপাদন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত থাকতেন। এই শ্রেণীভুক্ত মানুষেরাই ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সত্যি অর্থে 'মানুষ' বলে বিবেচিত হতেন। মানবিক অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি সবকিছুই ছিলো শুধুমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার মধ্যে এই শক্তিশালী শ্রেণীর এ জাতীয় চিন্তা এবং অধিকারবোধ পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হতো।

রাজা ও ভূম্যধিকারীরা যেহেতু ভূমিহীন কৃষকদের জীবনকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন, সেজন্যে নিজেদের কোন

কাজ অথবা সিদ্ধান্তের জন্যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের কাছে তাঁদের জবাবদিহির কোন প্রশ্ন উঠতো না। অর্থাৎ শাসনের জন্যে তাঁরা শাসিতের অনুমতির অপেক্ষা রাখতেন না। এজন্যে তখনকার রাষ্ট্রীয় কাঠামোও এমন ছিলো, যাতে করে সেরকম কোন রাজনৈতিক সম্মতি জ্ঞাপন অথবা গ্রহণের কোন উপায়ও তার মধ্যে ছিলো না। সে অবস্থায় রাজা কার্যত তাঁর অনুগত সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তত্ত্বগতভাবে তাঁর সকল রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মের জন্যে দায়ী থাকতেন খোদাতালার কাছে। অর্থাৎ তিনি প্রতিনিধিত্ব করতেন জনসাধারণের নয়, খোদাতালার।

এই প্রতিনিধিত্বের দাবীতে রাজরাজেশ্বরেরা বাস্তবত যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন তার চরিত্র ছিলো পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী। যে শোষণ ব্যবস্থার ওপর তখনকার শাসনব্যবস্থা স্থাপিত ছিলো, তার অপসারণ সাধারণ ভূমিহীন কৃষক ও অল্পবিত্ত মানুষের না থাকার ফলে মাঝে-মাঝে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাচারী সামন্ততান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

দুই

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজা ও ভূস্বামীদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলে অনেক সময় ভূমিহীন কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করতো, কখনো হয়তো অন্যান্য আরও নানাভাবে তারা ভূম্যধিকারীদের অধিকারকে খর্ব করতে চাইতো। এইসব প্রচেষ্টাই পরিশেষে নিষ্ফল হলেও তার দ্বারা উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হতো, তাদের শাসন-শোষণও নিশ্চিন্তভাবে সম্পন্ন হতো না। এজন্যে প্রয়োজন হতো নিম্নশ্রেণীর কৃষকদেরকে অনুগত রাখার বিবিধ ব্যবস্থা, যার মধ্যে ধর্ম ছিলো অন্যতম প্রধান।

ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে আনুগত্য শিক্ষা দেওয়া হতো এবং খোদাতালার প্রতিনিধি হিসেবে রাজা হতেন সেই আনুগত্যের সর্বপ্রধান দাবীদার। তাদের মনে এই আনুগত্যবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্রে চার্চ এবং ধর্মযাজকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বস্তুত তারাই এক্ষেত্রে রাজা ও ভূস্বামীদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সহযোগী।

রাজচক্রবর্তীদের স্বর্গীয় অধিকারের (Divine Right) তত্ত্ব ভূমিহীন কৃষক এবং সমাজের অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষদেরকে শোষণ করার প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত এবং সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার পক্ষে অপরিহার্য। এই তত্ত্বের ওপর রাষ্ট্র-সংক্রান্ত চিন্তাকে স্থাপন করলে রাজার প্রতি দেশের মানুষের আনুগত্যহীনতার কোন তত্ত্বগত ভিত্তি থাকে না এবং স্বেচ্ছাচারিতার পথও হয় পরিষ্কৃত। এজন্যে রাজার স্বর্গীয় অধিকারের তত্ত্ব সর্বাংশে স্বেচ্ছাচারিতারই রাষ্ট্রীয় দর্শন।

তিন

এই রাষ্ট্রীয় দর্শনের পতন ঘটে সতেরো শতকে। সে সময় ইওরোপীয় দার্শনিকেরা নতুন প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি সম্পর্কে নানা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে তার জবাব সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সতেরো শতকীয় দার্শনিক-দের চিন্তা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তৎকালীন ইওরোপীয় সমাজে কী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে সতেরো শতকে ইওরোপের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়। ইওরোপীয় সওদাগরেরা সে সময়ে আমেরিকায় দাস ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। এ ছাড়া ইংলণ্ডে তুলাজাত লৌহজাত এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন শুরু হয় এবং ভাড়া-খাটা মজুরদেরকে বিভিন্ন কারখানা বা ম্যানু-ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। তার ফলে একদিকে একটি নতুন বাণিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণী এবং অন্যদিকে নিঃস্ব দিনমজুর শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটে।

কৃষকদের ওপর ষ্টুয়ার্ট রাজাদের নানা অত্যাচার এবং অন্যদিকে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে রাখার ফলে কৃষি ও শিল্প উভয়েরই উন্নতি সে সময়ে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হতো। শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ বিক্রীর অনুমতিলাভের জন্যে রাজার কাছে আবেদন করতে হতো এবং উপযুক্ত সালামী দেওয়ার পর সে অনুমতি তারা লাভ করতো। সত্যিকার কারবারী লোকদেরকে এই অনুমতি না দিয়ে অনেক সময় রাজা নিজের বশংবদ সামন্ততান্ত্রিক আমলাদেরকে এইসব কারবারের অনুমতি দিতেন। তা ছাড়া

বহু জিনিসের উৎপাদন তাঁরা আইনত নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই নিষিদ্ধ দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে আবার পৃথকভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে হতো এবং সে অনুমতি তাদেরকেই দেওয়া হতো, যারা সেই সমস্ত দ্রব্যের একচেটিয়া কারবারের অধিকার রাজার নিকট থেকে ক্রয় করতে পারতো।

এক কথায় বলা চলে যে স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে ইংলণ্ডে কৃষি এবং শিল্প বাণিজ্য এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো, যাতে করে একটা বিপ্লব ব্যতীত তাদের উভয়েরই উন্নতির কোন পথ ছিলো না। বিপ্লবের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিলো এজন্যে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে নবউত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন প্রতিনিধিত্ব ছিলো না। কাজেই তাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি কর্ণপাত করার মতো কোন শক্তি সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মধ্যে ছিলো অনুপস্থিত।

ইংলণ্ডে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্রমওয়েল প্রথমে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করেন। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের পর রাজতন্ত্র সেখানে নিরাপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও তার সাথে পূর্ববর্তী রাজতন্ত্রের অনেক প্রভেদ ঘটে। নতুন রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব হয় এবং বণিক-ভূস্বামী শ্রেণীর লোকদের দ্বারা প্রভাবিত পার্লামেণ্ট প্রভুত্ব লাভ করে। তার পর থেকে কর ধার্যের ক্ষমতা রাজার হাত থেকে পার্লামেণ্টের কাছে হস্তান্তরিত হয়, রাজার কোন সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর দস্তখত ব্যতিরেকে কার্যকরী হবে না বলে স্থির হয়। তা ছাড়া, তখন থেকে রাজা খোদাতালার পরিবর্তে পার্লামেণ্টের কাছে নিজের কাজকর্মের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবেন—এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কাজেই, সতেরো শতকে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও বস্তুতপক্ষে সেখানে স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটে। নতুন আর্থিক জীবনের উন্নতির জন্যে স্বৈরতন্ত্রের অবসান অপরিহার্য ছিলো। এবং সেই অনুসারে স্বৈরতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় দর্শনেরও প্রয়োজন ছিলো পরিবর্তনের। এই প্রয়োজন থেকেই সতেরো শতকের নতুন-রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভব হয় এবং ইংলণ্ডের টমাস হব্‌স্‌ই হন তার প্রথম প্রধান প্রবক্তা।

হব্‌স্‌ রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও তাকে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা তিনি অনুমোদন করেন কিন্তু সেই সাথে এ কথাও বলেন যে কোন সার্বভৌম রাজা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্বের জোরে নয়; তাঁর ক্ষমতার

আসল উৎস হচ্ছে জনসাধারণের অথবা নাগরিকদের সম্মতি। তাঁর দর্শনে এই সম্মতিদানের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হলেও বিষয়টির অবতারণা ইওরোপীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তার ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী ঘটনা। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দুটি জিনিসের হাত থেকে রাষ্ট্র-দার্শনিক চিন্তা মুক্তি লাভ করে।

এর প্রথমটি হচ্ছে ধর্ম। মধ্যযুগে সর্বপ্রকার চিন্তার মতো রাষ্ট্রীয় চিন্তাও ধর্মপ্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলো। চার্চের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবল থাকায় রাজনৈতিক জীবনে তাকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু সতেরো শতকের দিকে শিক্ষিত হয়ে ইওরোপীয়ানদের জীবনে ধর্মীয় প্রভাব অনেকাংশে শিথিল হয়ে আসে। তা ছাড়া ধর্ম সে সময় সরাসরিভাবে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে বাধা দান করতে থাকে। এর ফলেও ধর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় চিন্তাকে ধর্মমুক্ত করা সেকালের আর্থিক অগ্রগতির পক্ষে তাই হয়ে দাঁড়ায় অপরিহার্য। হব্‌সের চিন্তায় বৃহত্তর জীবনের এই তাগিদই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস জনসাধারণের সম্মতি, এই তত্ত্বের মধ্যে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে নিষ্কৃতির সন্ধান পায়। কেন্দ্রীকৃত রাজতন্ত্র অনু-মোদনের দ্বারা হব্‌স্ নিজে পরোক্ষভাবে স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থন করলেও তত্ত্বগত-ভাবে স্বেচ্ছাচারিতার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেন। সামাজিক চুক্তির মুখ্য কথা হলো শাসনের জন্যে শাসিতের সম্মতি। এই সম্মতির প্রশ্ন উত্থাপন করে হব্‌স্ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তার দিকনির্দেশ করেন। তাঁর নির্দেশিত পথেই তাঁর দার্শনিক উত্তরসূরীরা নিজেদের চিন্তাকে চালন করে প্রথমে রাজতন্ত্রকে সীমিত এবং পরে বাতিল করে দেন। এইভাবে রাজতন্ত্র, সামাজিক চুক্তিবাদের দ্বারা ধর্ম এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে অনেকখানি গণতান্ত্রিক ও আধুনিক চরিত্র পরিগ্রহ করে। ইওরোপীয় সমাজ ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে উত্তীর্ণ হয়ে নতুন এক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সন্ধিক্ষণে তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যতাই পূরণ হয় সামাজিক চুক্তিবাদের দ্বারা। এই দর্শনের তাত্ত্বিক দুর্বলতা যাই থাক, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

চার

বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান এবং তার সাথে সামন্ততন্ত্রের সংঘাতের সময় থেকেই

ইওরোপীয় ধর্মজীবনে এক দারুণ সংকট উপস্থিত হয়। চার্চ ও যাজক সম্প্রদায় স্বার্থগতভাবে সামন্ততন্ত্রের সাথে সংযুক্ত ছিলো, কাজেই বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান ও প্রসারকে বাধা দানের ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ধর্ম একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এজন্যে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তার মুখপাত্ররাও তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। বস্তুত, ক্যাথলিক চার্চ সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার ফলেই তার সাথে বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত দার্শনিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ আঠারো শতকে এক চরম আকার ধারণ করে। ফরাসীদেশে এই নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বপ্রধান দার্শনিক মুখপাত্র ভল্‌তেয়ার ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করেন। কবিতা, নাটক, গল্প এবং দার্শনিক নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি অবিশ্রান্তভাবে প্রবৃত্ত হন সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটনে। তিনি সোজাসুজি ঘোষণা করেন যে, ধর্ম জালিয়াতি ব্যতীত কিছুই নয় এবং সেই জালিয়াতিতে তাঁদের কোন প্রয়োজন নেই। দিদেরো প্রমুখ বিশ্বকোষ রচয়িতারাও অনুরূপ মতই পোষণ করতেন।

• কিন্তু ধর্মের প্রতি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর অপর একটি দিকও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই তারা উপলব্ধি করলো যে ধর্মকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা তাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। এ কথা ভল্‌তেয়ারের মতো ধর্মদ্বেষী দার্শনিকও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই খোদাতালা এবং ধর্মে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস না করলেও সাধারণ মানুষকে বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতি অনুগত রাখার উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করার সপক্ষে তিনি ওকালতি করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

এ তো গেলো ফরাসী বিপ্লবের পূর্বের কথা। কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে বুর্জোয়া শ্রেণী চার্চের সহযোগিতার মূল্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আবদ্ধ হলো তার সাথে এক 'পবিত্র' আঁতাতে। সামন্ততান্ত্রিক শাসনের যুগে যে বুর্জোয়া শ্রেণী লিপ্ত ছিলো চার্চের সাথে শত্রুতায়, তারাই এবার নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের তাড়নায় নিযুক্ত হলো বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে ক্যাথলিক এবং বিশেষ করে প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের নতুন মৈত্রীবন্ধন।

পাঁচ

ফ্রান্সিস বেকনই (১৫৬১-১৬২৬) ইংলণ্ডে বস্তুবাদের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

করেন। বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক দর্শনকে অধিবিদ্যার (Metaphysics) প্রভাব-মুক্ত করে তাকে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠা করেন তিনিই। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে প্রাথমিক জ্ঞান আমরা লাভ করি, তার যুক্তিগ্রাহ্য বিচার ও বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হব্‌স্‌ বেকন এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বস্তুবাদকে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। কিন্তু মানুষের সমস্ত জ্ঞান তার অভিজ্ঞতার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল, এ কথা স্বীকার করলেও সে বিষয়ে সিদ্ধান্তসূচক কোন প্রমাণ হব্‌স্‌ দিতে সক্ষম হননি। সে প্রমাণ প্রথম পাওয়া গেলো জন লকের মধ্যে। তিনিই অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রমাণ উপস্থিত করেন। কাজেই ইংলণ্ডে বস্তুবাদী চিন্তার সূত্রপাত, সংগঠন ও দৃঢ়ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে বেকন, হব্‌স্‌ এবং লকের গুরুত্ব অপরিসীম। ডেভিড হিউম্‌ বস্তুরূপ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলেও:পদ্ধতিগতভাবে তাঁর কৃতিত্বও অসাধারণ।

আঠারো শতকের ফ্রান্সে যে বস্তুবাদী চিন্তার উত্থান হয়, সেটা ইংলণ্ডের পূর্ববর্তী অনুরূপ চিন্তা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব হতো না। তৎকালীন ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিকেরা সরাসরিভাবেই বৃটিশ বস্তুবাদী দার্শনিকদের উত্তরসূরী। এই বস্তুবাদ শুধুমাত্র ধর্মীয় চিন্তার সমালোচনাকে বিশেষভাবে অবলম্বন না করে তাকে চিন্তার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। তার ফলে আঠারো শতকীয় ফ্রান্সে ধর্মের সাথে বস্তুবাদের বিরোধ ও শত্রুতা আরও ঘোর-তর আকার ধারণ করে।

আঠারো শতকের সাধারণ ইংরেজ মধ্যবিত্ত তার সমশ্রেণীর ফরাসীদের থেকে অনেক বেশী রক্ষণশীল ও ধর্মানুসারী ছিলো। তার কারণ, গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ইংলণ্ডে সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা আপসরফার ফলে সেখানে সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শক্তির মধ্যে একটা লেন-দেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমাগত নতুন শক্তি সঞ্চয় করে গেলেও তার দ্বারা সামন্ততন্ত্র এবং প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের ধ্বংস সাধিত হলো না। উপরন্তু ধনতন্ত্রের প্রসার ও সমৃদ্ধির সাথে-সাথে শিল্পশ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত শক্তিকে দমন ও খর্ব করার উপায় হিসেবে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা উপ-লব্ধি করে তারা ধর্মের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকলো।

আঠারো শতকের ফ্রান্সে কিন্তু চিন্তার আবহাওয়া অন্যরকম ছিলো।

'গৌরবময় বিপ্লবে'র মতো কোন আপসরফা না হওয়ার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও ক্যাথলিক চার্চের সাথে বুর্জোয়াদের শত্রুতা সেখানে এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। বস্তুবাদী চিন্তাও সে সময় পরিগ্রহ করে একটা বৈপ্লবিক রূপ। সাধারণ কারিগরি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যবহার আপত্তিজনক ছিলো না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তা যখন সে পর্যায় উত্তীর্ণ হয়ে নানা মৌলিক তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করে তার সমাধান দানে প্রবৃত্ত হলো, তখন ক্যাথলিক চার্চের সাথে শুরু হলো তার সরাসরি শত্রুতা। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উপযোগিতার জন্যে তাকে বর্জন করার ক্ষমতা বুর্জোয়াদের ছিলো না। কাজেই আঠারো শতকের ফ্রান্সে চার্চের সাথে বিজ্ঞান এবং তার পৃষ্ঠপোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর এই শত্রুতা ছিলো অপরিহার্য।

এজন্যেই ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের কোন ধর্মীয় মুখোশ ছিলো না, সরাসরিভাবে সেটা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবেই গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং সামন্ততন্ত্রের সাথে কোন আপসরফার চেষ্টা না করে পরিশেষে তার পরিপূর্ণ উচ্ছেদসাধন করে।

ইংলণ্ডে বিপ্লব-পূর্ব ও বিপ্লবোত্তর অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সমঝোতার ফলে আইনের কাঠামোতে কোন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের বদলে সেখানেও একটা ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক আইনকানুন বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকে। কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লবের পর পূর্ব আইন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে নেপোলিয়নের আমলে সেখানে নতুন ধনতান্ত্রিক আর্থিক জীবনের উপযোগী এক আইন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এবং পরবর্তী সময়ে ইওরোপের অন্যান্য দেশেও তা বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করে।

ছয়

ফরাসী বিপ্লবের পর শুধু ফ্রান্সেই সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটলো, তা নয়। ইও-রোপের যে সমস্ত এলাকা ফরাসীদের আয়ত্তে এলো, সেগুলিতেও সামন্তবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুলাংশে বিনষ্ট হলো, অন্যদিকে ধনতন্ত্র এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিস্তার এবং আধিপত্যও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি লাভ করলো। এ পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হলো ফ্রান্স এবং ইওরোপের অন্যান্য কতগুলি দেশের প্রতি ইংলণ্ডের

বাণিজ্যিক নীতির ফলে। ফরাসী সামরিক শক্তিকে খর্ব করার জন্তে তারা ইওরোপে বহু শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করে দিলো। তার ফলে প্রয়োজনের তাগিদে ফ্রান্সকে অতি দ্রুতগতিতে সেই সমস্ত নিষিদ্ধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত শুরু করতে হলো। কাজেই, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে-সাথে তাদের আভ্যন্তরীণ শিল্পবাজার বহুলাংশে সম্প্রসারিত হতে থাকলো এবং রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের প্রভূত উন্নতিও সাধিত হলো।

শিল্পের উন্নতির জন্তে 'জাতীয় শিল্পোন্নতি সংস্থা' নামে একটি সংস্থাও নেপোলিয়নের সময়ে স্থাপিত হয়েছিলো এবং নেপোলিয়ন ও তাঁর সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারীরা ছিলেন তার প্রধান-প্রধান অংশীদার ও কর্মকর্তা। শিল্পের এই দ্রুত ও প্রভূত উন্নতির ফলেই নেপোলিয়নের পক্ষে ইংলণ্ড এবং ইওরোপের অন্যান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা এবং বিস্তৃত এলাকা দখল সহজতর হয়েছিলো।

নেপোলিয়নের উত্থান প্রকৃতপক্ষে ছিলো ফ্রান্সে বৃহৎ বুর্জোয়ার উত্থান। এজন্তে তাঁর রাজত্বকালে শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে বহু আইন রচিত হয়, এমনকি ছোটখাটো ধর্মঘটের অধিকার থেকেও তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়। অন্যদিকে, নেপোলিয়নের সর্বময় কর্তৃত্বলাভের পূর্বেই জ্যাকবিন ক্লাব বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে যে রাজনৈতিক নীতির সূচনা হয় নেপোলিয়নের সময়ে সেই নীতিকেই আরও সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে শিল্প-শ্রমিকদের সংগঠিত শক্তিকে রুদ্ধ ও খর্ব করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের সাথে বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের নতুন সম্পর্ক স্থাপনই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময়ে ধর্মকে নানাভাবে আঘাত করেছিলো এবং তার শক্তিকে সর্বপ্রকারে খর্ব করতে ব্যাপৃত ছিলো, সেই বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধি নেপোলিয়ন ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপের সাথে সমঝোতা করে নতুন আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমর্থনে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। চার্চের যে সমস্ত জমিজমা এবং অন্যান্য সম্পত্তি তখন পর্যন্ত অবিক্রীত ছিলো সেগুলিকে ধর্মযাজকদের হাতে ফেরত দেওয়া হলো, এমনকি তাদের বেতন পর্যন্ত রাষ্ট্রের তহবিল থেকে প্রদান করার ব্যবস্থা হলো।

সাত

উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংলণ্ডে ভূম্যধিকারী অভিজাতদের সাথে বুর্জোয়া-দের কার্যকরী সম্পর্ক অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হতে আরম্ভ করে। পূর্বে সামাজিক দিক থেকে নিজেদেরকে অভিজাতদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করায় নানাভাবে তারা অভিজাতদেরকে মান্য করে চলতো এবং তাদের নেতৃত্বও স্বীকার করতো। অভিজাতদের সমাজে কোনপ্রকারে ঠাঁই পাওয়াটাকে সে সময় তারা মহা ভাগ্যের ব্যাপার বলেও বিবেচনা করতো। কিন্তু ধনতন্ত্রের ক্রমপ্রসারের ফলে উদ্ভূত নতুন অবস্থায় সে সম্পর্ক বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব হলো না। এ কথার অর্থ আবার এই নয় যে, ফ্রান্সের মতো ইংলণ্ডেও অভিজাতদের সাথে বুর্জোয়াদের সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হলো। এর অর্থ হলো, নিজেদের আর্থিক স্বার্থকে রক্ষা ও প্রসারের জন্যে যে আংশিক রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন, সে ক্ষমতা অভিজাতদের হাত থেকে আদায় করা ব্যতীত বুর্জোয়া-দের কোন উপায় থাকলো না। কিন্তু ভূম্যধিকারী অভিজাতরা সে রাজ-নৈতিক ক্ষমতা সহজে বুর্জোয়াদের কাছে হস্তান্তরিত করারও পক্ষপাতী ছিলো না। কাজেই অভিজাত ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে পার্লামেন্টের সংস্কার প্রশ্ন নিয়ে এক রাজনৈতিক সংঘাত ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করলো। তারপর ১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের ধাক্কায় বাধ্য হয়ে ১৮৩২ সালে অভিজাতেরা পার্লামেন্টের সংস্কারসাধন করলে কিছুসংখ্যক বুর্জোয়ার পার্লামেন্ট প্রবেশের পথ পরিষ্কৃত হলো।

কিন্তু ১৮৩২ সালের এই সংস্কার আইনের দ্বারা বুর্জোয়ারা উপকৃত হলেও তাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হলো না। কারণ, সংস্কার আন্দোলনকালে বুর্জোয়াদের সাথে শিল্পশ্রমিকরাও ব্যাপকভাবে শরিক হয়েছিলো। রাজ-নৈতিক অধিকারের দাবীতে তারাও অভিজাতদের কাছে দাবী করেছিলো পার্লামেন্টের সংস্কার। কিন্তু নতুন সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পর তাদের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন হলো না। ১৮৩২ সালে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক অধিকারলাভের পর আরও বিস্তৃত সংস্কারের জন্য কোন নতুন আওয়াজ তুললো না এবং তখন থেকেই শিল্পশ্রমিকদের সাথে শুরু হলো তাদের সংগঠিত শত্রুতা। তাদের সাথে এই সংঘাতের সময় বুর্জোয়া এবং ভূম্যধিকারী সামন্ত

পরস্পরের সাথে হাত মেলালো এবং শ্রমিকদেরকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে আবার শুরু হলো তাদের সহযোগিতা। এজন্যেই ইংলণ্ডে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কখনই আয়ত্ত করতে পারেনি। প্রথমদিকে ভূম্যধিকারীদের সাথে এবং পরবর্তীকালে শিল্পশ্রমিকের সাথে তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে হয়েছে। এ কথা শুধু ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে নয়, সকল দেশের বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রেই সত্য ; কিন্তু ইংলণ্ডে পরিবর্তন খুব আকস্মিকভাবে না আসার দরুন কোন সময়েই বুর্জোয়ারা সামন্ত ভূম্যধিকারীদের মতো নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

১৮৩২ সালের সংস্কার আইনে ইংলণ্ডের শিল্পশ্রমিকেরা পার্লামেন্টে কোন আসন না পাওয়ার ফলে তারা বৃহৎ আকারে আন্দোলন শুরু করে। নিজেদের দাবী সম্বলিত একটি চার্টারকে কেন্দ্র করে আন্দোলনটি গঠিত হয়েছিল বলে তার নাম হয় চার্টিস্ট আন্দোলন এবং যাঁরা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা চার্টিস্ট নামে পরিচিত হন। এই চার্টিস্টদেরকেই এঙ্গেল্‌স্ আধুনিক যুগের প্রথম শিল্পশ্রমিকদের দল হিসেবে অভিহিত করেন। চার্টিস্টদের এই সংস্কার আন্দোলন প্রবল শক্তি সংগ্রহ করে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু তাদের দাবী শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত না হওয়ার কারণ, একদিকে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে নানাপ্রকার তত্ত্ব-গত হতবুদ্ধিতা ও সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা। তবে শিল্পশ্রমিকদের এই সংস্কার আন্দোলনের পতন হলেও তার মাধ্যমে সাধারণভাবে তাদের রাজনৈতিক চেতনা অনেকখানি অগ্রসর হয়। অবশ্য, তখন পর্যন্ত শিল্পশ্রমিকদের কোন বৈজ্ঞানিক সংগঠন সম্ভব না হওয়ার ফলে তারা লিবারল পার্টির আওতায় একটি চরমপন্থী দল হিসেবে পার্লামেন্টারী সংস্কারের জন্যে চেষ্টা করে যেতে থাকে।

বৃটিশ বুর্জোয়ারা অনেক পূর্বেই জনসাধারণ ও শিল্পশ্রমিকদেরকে ধর্মপ্রভাবে রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি কারেছিলো, কিন্তু চার্টিস্ট আন্দোলনের পতন, ১৮৪৮-৪৯ সালের ফরাসী বিপ্লব এবং প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের বিপ্লবের ফলে তারা এই প্রয়োজনীয়তাকে আরও বেশী করে উপলব্ধি করলো। এজন্যেই তারা চার্চ এবং অন্যান্য ধর্ম সংগঠনগুলিকে বহুভাবে অর্থ সাহায্য করে তাদের ধর্মের ব্যবসা নতুনভাবে ফাঁদার ব্যবস্থা করেছিলো। শুধু তাই নয়, এর জন্যে তারা স্কুল বোর্ডে পাদ্রীদের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করলো, এমনকি নিজেদের ওপর

কিছু-কিছু বিশেষ কর ধার্য করে পুনর্জাগরণবাদী সংস্থা (revivalist society), ধর্মীয় মুক্তি ফৌজ (Salvation Army) ইত্যাদি গঠন ও পোষণ করারও ব্যবস্থা করলো। বুর্জোয়ারা ইওরোপে সর্বত্রই এই চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু ইংলণ্ডে তাদের সাফল্য এসেছিলো সর্বাধিক।

আট

ইওরোপে আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের উত্থানের সাথে-সাথে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার যথেষ্ট গুরুত্ব বাড়ে। শুধু দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে নয়, সাধারণ মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও যুক্তির প্রভাব অনেকাংশে বৃদ্ধি লাভ করে। এর ফলে সমাজের বহু অসংগতি, অন্যায় এবং কুসংস্কারের চরিত্র তাঁদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়। সমসাময়িক সমাজ এবং জীবন ব্যবস্থা তাঁদের কাছে মনে হয় সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। আধ্যাত্মিক, আধিমানসিক, সামজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের এই বিপর্যস্ত অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে তাঁরা যুক্তিনির্ভর এক জীবনব্যবস্থা গঠনের চিন্তায় ব্যাপৃত হন।

কিন্তু যুক্তিনির্ভরশীলতা সত্ত্বেও তাঁদের প্রচেষ্টাজনিত ব্যবস্থায় যুক্তির পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হলো না। কারণ, সেখানে দেখা গেল যে অধিকার, আইনের সমতা, স্বাধীনতা, ব্যক্তির মর্যাদা, সবকিছুই সমাজের অল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী মানুষ, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের জন্য। এটা ঘটলো এই কারণে যে বুর্জোয়ারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকার করলো একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে। শুধু তাই নয়, নবোত্থিত বুর্জোয়ারা নিজেদের অবস্থার দ্রুত উন্নতির জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যকে পরিণত করলো শঠতায়। চতুর্দিকে অনাচার, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি, দাঙ্গাবাজী, জুয়াচুরি অভাবিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র জীবনে নিয়ে এলো বিস্তৃত নৈতিক নৈরাজ্য। এর ফলে দেখা গেলো যে আঠারো শতকের বস্তুবাদী দার্শনিকদের 'যুক্তির রাজত্ব' উনিশ শতকে এসে পর্যবসিত হলো তারই একটি ব্যঙ্গচিত্রে। সমাজের একদিকে সঞ্চিত হতে থাকলো প্রভূত ধনসম্পদ এবং অন্যদিকে বিস্তৃত ও প্রকটতর হলো দারিদ্র্য এবং হতাশা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কয়েকজন দার্শনিক এই হতাশাকে সংগঠিত চিন্তার মাধ্যমে রূপদান করতে এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে সাঁ সিমন, ফ্রাঁসওয়া ফুরিয়র এবং রবার্ট আওয়েনের নামই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

নয়

হেনরী সাঁ সিমন (১৭৬০-১৮২৫) ফ্রান্সের একটি অভিজাত এবং ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হয়। মাত্র তেরো বছর বয়সে নিজের কমুনিয়ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করার ফলে তাঁর ধর্মানুগত পিতা তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে তাঁকে জেলবন্দী রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে ব্যবস্থাতে ভীত না হয়ে তিনি জেলারকে গায়ের জোরে পরাভূত করে সেখান থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হন। উনিশ বছর বয়সে তিনি ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অফিসার হিসেবে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন এবং তারপর ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ১৭৮৩ সালে দেশে ফেরত আসেন। সৈন্যবাহিনীতে পদমর্যাদা এবং ঐশ্বর্যগত সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি সে পদে ইস্তফা দিয়ে জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ও তাদের উন্নতি সাধন করার সিদ্ধান্ত নেন।

সাঁ সিমনকে এঙ্গেল্‌স্ ফরাসী বিপ্লবের সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। বিপ্লব প্রথমদিকে ছিলো যাজক ও সামন্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত বিজয়। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই সে জয়ের চরিত্র পরিবর্তিত হলো। দেখা গেলো যে, সত্যিকার ক্ষমতা শ্রমিকদের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়েছে সম্পত্তিশালী মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বুর্জোয়াদের হাতে। অভিজাত শ্রেণী ও চার্চের যে সমস্ত জমিজমা বিপ্লবের পর বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো, সেগুলো নানাভাবে করায়ত্ত করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে শঠতার আশ্রয় নিয়ে তারা দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার ফলে নেপোলিয়নের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা দখল সহজ হলো। এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নেপোলিয়ন বৃহৎ বুর্জোয়া স্বার্থকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে নিযুক্ত হলেন।

সাঁ সিমন শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন না। কাজেই তিনি ফ্রান্সের যাজক, অভিজাত এবং অন্যান্যদের মধ্যে সংঘর্ষকে মূলত 'শ্রমবিমুখ' এবং 'পরিশ্রমকারী' মানুষদের সংঘর্ষরূপে দেখলেন। শ্রমবিমুখ বলতে তিনি তাদেরই বোঝাতে চাইলেন, যারা কোনোপ্রকার পরিশ্রম না করে অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করে। ধর্মযাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে তনি বলতেন যে তারা যদি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তা হলেও সমাজের

কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অন্তদিকে পরিশ্রমকারী বলতে তিনি বোঝালেন শিল্পশ্রমিক, ব্যবসাদার, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ইত্যাদিকে। শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে অগ্রসর না হওয়ার জন্তে তিনি সমগ্র 'থার্ড এস্টেট' অর্থাৎ বুর্জোয়া ও শ্রমিকদেরকে পরিশ্রমকারী বলে অভিহিত করেই অনেকখানি নিশ্চিন্ত হলেন, তিনি তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব লক্ষ করলেন না। এবং এই কারণেই তাঁর পরবর্তী বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ালো অনেকাংশে অবৈজ্ঞানিক। 'শ্রমবিমুখ' যাজক অভিজাতেরা যে নেতৃত্বের অধিকার এবং যোগ্যতা দুইই হারিয়েছিলো, সেই বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিলো না কিন্তু নতুন আর্থিক ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতিতে শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ইত্যাদি বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত মানুষদের ভূমিকা যথার্থভাবে অনুধাবন না করার ফলে তিনি মনে করতেন যে, তাদের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত। 'সম্পত্তিহীন' শ্রমিকরা এ দায়িত্বভার বহন করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না, কারণ, 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' কায়েম থাকাকালীন যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো সেটাকে তিনি ভ্রান্তভাবে তাদেরই ক্ষমতা দখলের ফল বলে বিবেচনা করেছিলেন। কাজেই, সমাজকে নতুনভাবে গঠন করার দায়িত্বভার দিতে হবে বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে যারা অগ্রণী, তাদেরই হাতে। এ বিষয়ে তাদেরই যোগ্যতা সর্বাধিক। এই বুর্জোয়ারা অন্যান্তদের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে ক্ষমতাশালী ও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা অতিরিক্ত সুবিধাভোগের দাবীদার হলেও আসলে তারা একধরনের সরকারী কর্মচারী অথবা সামাজিক জিম্মাদার। কাজেই জনসাধারণ এবং সাধারণ শ্রমিকদেরকে মুনাফার জন্তে শোষণ করার কোন অধিকার তাদের নেই। শুধু যোগ্যতার কথা বিবেচনা করেই দেশের শাসন ও আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার তাদের ওপর অর্পণ করা দরকার, অন্ত কারণে নয়।

সাঁ সিমন শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস না করলেও এ কথা স্বীকার করেন যে, অর্থনীতিই হচ্ছে রাজনীতির প্রকৃত ভিত্তি। শুধু তাই নয়, তিনি এ কথাও মনে করতেন যে, ভবিষ্যতেও মানুষের ওপর রাজনৈতিক শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটবে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের দ্বারাই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটবে।

প্রচলিত খৃষ্টধর্মে সাঁ সিমন বিশ্বাস করতেন না। তবু একধরনের মানবতাবাদী ধর্ম তিনি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন, যার মধ্যে 'মিস্টিক' প্রভাব

প্রেম প্রবল ছিল। এই ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনাতেই তাঁর চিন্তার অবৈজ্ঞানিক চরিত্র সবথেকে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই আলোচনাক্ষেত্রে তিনি যুক্তির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে কল্পনাকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করেছিলেন।

নিজের দারুণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও সাঁ সিমন দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধারের নানা পরিকল্পনা নিয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করে যেতেন। লেখা ছাপার অর্থ না থাকার জন্যে সমস্ত কিছু স্বহস্তে কপি করে তিনি বহু লোকের কাছে পাঠাতেন। এ ব্যাপারে ইওরোপের বুর্জোয়া বণিক-শ্রেণীর কাছ থেকে সাঁ সিমন উৎসাহ এবং সাহায্য আশা করেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে সর্বতোভাবে নিরাশ করেছিলো। কোন সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাঁর লেখা পড়ার মতো ধৈর্য এবং উৎসাহ পর্যন্ত তাদের ছিলো না।

দশ

ফ্রাসোঁয়া ফুরিয়র (১৭৭২-১৮৩৭) জীবনের অধিকাংশ সময় সওদাগরী অফিসে কেরানী হিসাবে কাজ করেন। কাজেই পেশাগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে কিছুটা সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে তৎকালীন ইওরোপীয় সমাজের অবস্থাকে খুবই দক্ষতার সাথে তিনি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে উদ্ভূত সাধারণ দারিদ্র্য এবং নৈতিক নৈরাজ্যের সাথে তিনি পূর্ববর্তী দার্শনিকদের স্বপ্নময় জগতের তুলনা করে দেখতে চেষ্টা করেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ ধরনের উচ্চ দার্শনিকতার সাথে বাস্তব অবস্থার কোন সামঞ্জস্য নেই। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগে বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের অসাধু ও শঠতামূলক আচরণকেই তিনি বিশেষভাবে আক্রমণ করেন। ধনতন্ত্রের পরিকল্পনাহীন উৎপন্নসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে যে অসাম্য এবং অন্যায় নিহিত আছে, তিনি ছিলেন তারও একজন কঠোর সমালোচক। শ্রেণীসংগ্রামে ফুরিয়রও বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ কথা স্বীকার করতেন যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী হতে বাধ্য।

বুর্জোয়া সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কেরও তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে, কোন বিশেষ সমাজে সাধারণ মানুষ কতখানি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সেটা যাচাই করার জন্যে সেই সমাজে স্ত্রীজাতি কতখানি

মর্যাদাসম্পন্ন, সেটা দেখা দরকার।

পৃথিবীর ইতিহাসকে ফুরিয়র দাস যুগ, বর্বর যুগ, পিতৃপ্রধান যুগ ও সভ্য যুগ, এই চার পর্যায়ে বিভক্ত করেন। সভ্য যুগ আসলে হলো বুর্জোয়া যুগ। সভ্যতা, তাঁর মতে একটি বিষাক্ত বৃত্ত, যার মধ্যে নানাপ্রকার স্ববিরোধিতার দেখা মেলে। ধনসম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে নিদারুণ দারিদ্র্য, এই স্ববিরোধিতারই অন্যতম উদাহরণ।

কিন্তু এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও নতুন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় কিভাবে এবং কাদের সহযোগিতায় তার অবসান ঘটতে পারে, এ সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু ধারণায় ফুরিয়র উপনীত হতে পারেননি। এজন্যে তিনি মনে করতেন যে সমাজে ধনী-দরিদ্র সকলে মিলেমিশে থাকতে পারবে। উৎপাদন ক্ষেত্রেও পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য এবং নৈতিক নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তিনি নিজের একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেন এবং তাকে কার্যকরী করার জন্যে সাঁ সিমনের মতোই ইওরোপের বহু ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে আবেদন জানান। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাঁর আবেদনে তাদের মধ্যে কেউই সাড়া দেয়নি।

তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা কতকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থার (ফ্যালান্সটারি) মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তাদের প্রত্যেকটিতে ষোল শত ব্যক্তি নিযুক্ত থাকবে। তারা একক্ষেত্রে এক-একটি বিরাট হোস্টেল জাতীয় বাড়িতে বসবাস করবে এবং মিলিতভাবে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করবে। এই সংস্থার মধ্যে সকলেই পরস্পরের সমান বলে বিবেচিত হবে, কাজেই তার মধ্যে কোন অহেতুক প্রতিযোগিতা অথবা নির্দয় শাসন-শোষণের অস্তিত্ব থাকবে না। এর ফলে সমাজে প্রভূত ধনসম্পদ উৎপন্ন হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে মানুষের যোগ্য নতুন জীবনযাপন করতে সমর্থ হবে।

এগারো

রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) মাত্র নয় বছর বয়সে জীবিকা অর্জনের জন্য এক বস্ত্রব্যবসায়ীর কাছে শিক্ষানবিসী শুরু করেন। পরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে তাঁতের কাপড় তৈরীর কাজে নিযুক্ত হন এবং শীঘ্রই

ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এর কিছুকাল পরে তাঁর কোম্পানি নিউ লানার্কে অবস্থিত স্কটল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা বড় কাপড়ের কারখানাটি ক্রয় করে এবং তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সেই কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন।

অন্যান্য কারখানার মতো নিউ লানার্কেও শ্রমিকেরা অল্প বেতন পেতো, কারখানার জীবনকে ঘৃণা করতো এবং মদ্যপান করে নিজেদের অর্থ স্বাস্থ্য এবং শান্তি নষ্ট করতো। ছেলেমেয়েদেরকেও কারখানায় কাজ করতে হতো এবং উপযুক্ত খাদ্য, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির অভাবে এবং কারখানার অতিরিক্ত পরিশ্রমে সকলেই ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়তো। নিউ লানার্কের পরিচালনভার গ্রহণ করার পর থেকে আওয়েন সেখানকার শ্রমিক ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীদের সমবায়ে গঠিত সমগ্র শিল্পসমাজটির সংস্কার ও উন্নয়নকার্যে ব্যাপৃত হন।

আওয়েন মনে করতেন যে মানুষের ব্যক্তিচরিত্র তার নিজের সৃষ্টি নয়। উত্তরাধিকার ও পরিবেশ, এ দুইয়ের দ্বারাই তা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত। কাজেই চরিত্রের ভালোমন্দের জন্যে কোন মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা চলে না। চরিত্র গঠনের চেষ্টা করতে হলে প্রয়োজন মানুষের পরিবেশকে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। সামাজিক জীবনযাপনকালে সে যে সমস্ত প্রভাবের আওতায় থাকে, সেগুলিকে বাদ দিয়ে চরিত্র গঠন অথবা সংস্কার, কোনটিই সম্ভব নয়। এবং পরিবেশের পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিক্ষা। এই শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত দু-বছর বয়স থেকে।

আওয়েন মনে করতেন, মানুষের সব শয়তানী এবং দুঃখদুর্দশার কারণ পূর্বপুরুষদের অজ্ঞতা। রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় বিরোধের অবসান ঘটবে তখনই, যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে তাদের মতামতগুলো সবই পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের প্রভাবে গঠিত, তারা নিজেরা তার জন্যে দায়ী নয়। একমাত্র তখনই তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি বাদ দিয়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। মানুষ নিজে যে তার চরিত্র গঠন করতে পারে না, এ কথা চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। এ স্বীকৃতি ছাড়া তার মুক্তি নেই।

আওয়েন বিপ্লবের পথে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির কথা চিন্তা করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক পথেই মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা

প্রাপ্ত হলে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করাও সম্ভব। ফুরিয়রের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে ধন উৎপাদন প্রভূতভাবে বর্ধিত হতে পারে।

আওয়েন এমন একধরনের 'সমবায় পল্লী' গঠন করতে চেয়েছিলেন, যাতে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবে। তাঁর এই 'সমবায় পল্লী'র সাথে অনেকক্ষেত্রে ফুরিয়রের 'ফ্যালান্সা-টারি'র কিছু সাদৃশ্য আছে।

প্রত্যেক সমবায় পল্লীতে আটশো থেকে বারোশো লোক থাকবে এবং তারা প্রত্যেকে ছয় থেকে আঠারো একর জমি আবাদ করবে। কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হবে, তবে কিছু-কিছু শিল্পজাত দ্রব্যও তারা উৎপাদন করতে পারবে। পল্লীর লোকেরা সকলে একত্রে বসবাস করবে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, সবকিছুরই ব্যবস্থা সেখানে থাকবে এবং তারা একই পরিবারভুক্ত বলে পরিগণিত হবে। এই পল্লীসমাজে বসবাসকালে মানুষের মনে একটা নতুন মানবিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হবে।

শিল্পবিপ্লবের সময় যাঁরা কারখানার মালিক অথবা তার পরিচালক ছিলেন, তাঁরা সকলেই শ্রমিকদেরকে যথাসম্ভব শোষণ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি-সাধনে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আওয়েন নিউ লানার্কের পরিচালনভার গ্রহণ করার পর তাঁর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত ধারণাগুলোকে বাস্তব রূপ-দানের প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি সেখানে যে শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন, সেটাই ছিলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম শিশু বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে দু-বছর বয়সে শিশুরা ভর্তি হতো এবং সেখানে তাদের আদর যত্ন এবং খেলাধুলার এত সুন্দর ব্যবস্থা থাকতো যে, তারা বাড়ি ফিরে যেতে তেমন উৎসাহ বোধ করতো না। সেকালে সব কারখানাতেই শ্রমিকদেরকে তেরো-চোদ্দ ঘণ্টা খাটানোর নিয়ম ছিলো, কিন্তু নিউ লানার্কে আওয়েন কর্মকালকে কমিয়ে সাড়ে দশ ঘণ্টায় নামিয়ে এনেছিলেন। শুধু তাই নয়, একবার তুলো সরবরাহের অসুবিধার জন্যে কারখানা চার মাসের জন্যে বন্ধ থাকাকালে তিনি শ্রমিকদের বেতন না কেটে অথবা তাদেরকে ছাঁটাই না করে তাদের প্রত্যেককে পুরো বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানে কারখানায় কাজকর্ম এত শৃঙ্খলা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালিত হতো যে, শ্রমিকদেরকে এত সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও

ব্যবসাতে তাঁদের মুনাফার ঘাটতি হতো না। এই সমস্ত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে আওয়েন নিউ লানার্কের প্রায় আড়াই হাজার শিল্পশ্রমিকের জীবন থেকে মাতলামি, ঝগড়া-বিবাদ, খুন-খয়রাত, জেল হাজত, অশিক্ষা ইত্যাদি দূর করে তাদেরকে মানবিক জীবনযাপনের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো এই যে মানুষ উপযুক্ত পরিবেশের আওতায় থাকলে তার পক্ষে মানুষের যোগ্য জীপনযাপন সম্ভব। নিউ লানার্কের সমাজকে নিজের ধারণামতো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তিনি এর সত্যতাকে অনেকখানি প্রমাণ করেন।

কিন্তু এই সাফল্য অর্জনের পর আওয়েনের অন্তরে অন্য একটি মৌলিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে এক হিসেবে তাঁর পরীক্ষা সফল হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, নিউ লানার্কে শ্রমিকেরা যে সুবিধাসমূহ ভোগ করছে তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সেখানকার আর্থিক ও সামাজিক জীবন সর্বাংশে তাঁরই ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই আগামীকাল তিনি যদি নিজের মত পরিবর্তন করে তাদেরকে অন্যান্য শিল্পপতিদের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধা দান করতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাদের জীবন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে যাবে এবং অন্যান্য কারখানার মতো সেখানেও আবার অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য এবং অপরাধের রাজত্ব কায়েম হবে। এ উপলব্ধির অর্থ হলো এই যে, ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর কোন ব্যবস্থা যতদিন নির্ভরশীল, ততদিন পর্যন্ত সে ব্যবস্থা অবাস্তব ও বিপজ্জনক হতে বাধ্য। কাজেই তাকে অন্য কোন ভিত্তির ওপর স্থাপন করা দরকার।

আওয়েনের এ জাতীয় চিন্তার সূত্র কিন্তু এখানেই ছিন্ন হলো না। তিনি উৎপাদন বিতরণের ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। নিউ লানার্কে নিযুক্ত আড়াই হাজার শ্রমিক যে পরিমাণ ধন উৎপাদন করতো সে পরিমাণ ধন উৎপন্ন করতে পঞ্চাশ বছর পূর্বে ষাট হাজার শ্রমিককে নিযুক্ত করতে হতো। শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমিকদের উৎপাদন শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই উৎপাদনবৃদ্ধি সত্ত্বেও শ্রমিকদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। আওয়েন যে প্রশ্ন তুললেন, তার অর্থ এই যে, পূর্বে ষাট হাজার শ্রমিক যা উৎপন্ন করতো, তাতে মালিককে যথেষ্ট মুনাফা দান করেও ষাট হাজার

মানুষের ভরণ-পোষণ চলতো। এখন আড়াই হাজার লোক সেই একই পরিমাণ ধন উৎপাদন করছে এবং আড়াই হাজারের ভরণ-পোষণের জন্যে তার থেকে ব্যয় করা হচ্ছে। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় যদি শ্রমিকদের আর্থিক জীবনের প্রভূত উন্নতি না হয়ে তারা দরিদ্র অবস্থাতেই জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে ষাট থেকে আড়াই বাদে সাড়ে সাতান্ন হাজার মানুষের ভরণ-পোষণের জন্যে পূর্বে যে সম্পদ ব্যয় হতো, সেগুলো গেল কোথায়? শ্রমিকদের কাছে যদি এই অতিরিক্ত উৎপাদনের ভাগ না আসে, তাহলে সেটা যায় কার ঘরে? এ প্রশ্নের উত্তরও তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিলো না। সাড়ে সাতান্ন হাজার শ্রমিকের জন্যে পূর্বে যা ব্যয় করা হতো, শিল্পবিপ্লবের পরে সেটা অতিরিক্ত মুনাফা হিসেবে শিল্পমালিকদের আয়ের অঙ্ককেই স্ফীত করতো।

এঙ্গেল্‌স্ উল্লেখ করেছেন যে, যতদিন আওয়েনের চিন্তা মোটামুটিভাবে সংস্কারমূলক ছিলো ততদিন বুর্জোয়া সমাজে, এমনকি ইওরোপের সমস্ত অভিজাত সমাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানীয় এবং প্রশংসিত ব্যক্তি। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে তাঁর চিন্তা কিছুটা কম্যুনিজমের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো, সে মুহূর্ত থেকেই তাঁর কদর ইওরোপীয় বুর্জোয়া এবং অভিজাত সমাজে কমতে-কমতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হলো। যে খবরের কাগজগুলি পূর্বে আওয়েনের প্রশংসায় মুখর থাকতো, তারা তাঁর খবর ছাপা বন্ধ করলো এবং উচ্চ সমাজ থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত হলেন। আমেরিকার নিউ হারমনীতে তিনি যে সাম্যবাদী পরীক্ষা শুরু করেছিলেন সেটাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তাঁর প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হলো। এর পর থেকে আওয়েন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রমিকদের উন্নতির জন্যে অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করেছিলেন। ইওরোপের এবং বিশেষ করে ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত ছিলো। ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের প্রথম কংগ্রেসের তিনি সভাপতি ছিলেন। সমবায় আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা। ফুরিয়রের মতো তিনিও ধনতান্ত্রিক বাণিজ্যিক লেনদেনের একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং এজাতীয় বাণিজ্যের বিলোপসাধনের জন্যেই তিনি মূলত উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের উদ্বোধন করেন।

বারো

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় অনেক শ্রমিক বিপ্লব ঘটেছিলো। ১৮৩১ সালে ফ্রান্সের লিয়ন শহরে বিদ্রোহী শ্রমিকেরা দশ দিন যাবৎ শিল্প নগরটির কর্তৃত্বে ছিলো। কিন্তু কর্তৃত্ব নিয়ে কী করতে হবে, অর্থাৎ কর্তৃত্বলাভের পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কী হতে পারে, এ সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণার অভাবে কোন সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় ঘটলো। ১৮৩০-৩২ সালে ইংলণ্ডের সংস্কার আন্দোলনের পরিণতিও তাই হলো। ১৮৩২ সালের সংস্কার প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে সমস্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রমিকের মিলিত আন্দোলনের অবসান ঘটালো। সংস্কারের দ্বারা শ্রমিকদের কোন লাভ না হলেও তাদের শিক্ষা সেই ব্যর্থতার দ্বারা অনেকখানি অগ্রসর হলো। বুর্জোয়াদের সাথে তাদের স্বার্থের যে কোন যোগ নেই, এ উপলব্ধি তাদের মধ্যে এলো। এজন্যেই ১৮৩২ সালের পর থেকে নতুন সংস্কারের জন্যে চার্টিস্ট আন্দোলন পূর্বের থেকে আরও বেশী বৈপ্লবিক পরিণতি ও সাংগঠনিক উৎকর্ষ লাভ করলো। কিন্তু তত্ত্বগত দুর্বলতা এবং নিম্নবুর্জোয়া প্রভাবের ফলে সে আন্দোলনও ১৮৪৮ সালে ব্যর্থ হলো। তারপর ইওরোপে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পশ্রমিক বিদ্রোহ ঘটেছিলো, কিন্তু তার মধ্যে কোনটিরই সাফল্য আসেনি। এসবগুলির ব্যর্থতার কারণ মোটামুটিভাবে একই।

একমাত্র আওয়েন ব্যতীত পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীদের কারও সাথে শ্রমিকদের তেমন কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিলো না। কিন্তু আওয়েনের প্রচেষ্টাও ছিলো ব্যক্তিগত। তাঁর সাথে কোন বিপ্লব বা বিপ্লবী জনসাধারণের সম্পর্ক ছিল না। কাজেই তাঁরা সকলেই সর্বশ্রেণীর সহ-অবস্থান ও আপোষের মধ্যে দিয়ে একটা কিছু হবে, এই আশাই পোষণ করতেন।

লেনিন বলেছিলেন যে, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোন সত্যিকার বিপ্লবী কর্মপন্থা থাকতে পারে না। এই বিপ্লবী তত্ত্বের অভাবেই সেকালে বিপ্লবী কর্মপন্থার অভাব ঘটেছিল। কোন-কোন ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চেষ্টা ছিল অনেকাংশে অবাস্তব ও অসম্পূর্ণ।

পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বাস্তবতার অভাবের কারণ তৎকালীন ঐতিহাসিক অবস্থা। শিল্পবিপ্লবের পর ইওরোপে ধনতন্ত্রের ক্রমাগত বিকাশ হতে থাকলেও তার পূর্ণ চরিত্র তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এ পর্যায়ে সমাজতন্ত্রীদের প্রতিভা, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা থাকলেও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের দিক-নির্ণয় অথবা দার্শনিক ভিত্তি রচনা, কোনটাই তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। এসব সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁদের দান অনস্বীকার্য। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণ-পদ্ধতির মধ্যে যে অযুক্তি এবং অবিচার নিহিত আছে তাঁরা তার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। এ অযুক্তি এবং অবিচার দূর করার অন্য পথ তাঁরা নির্দেশ করতে অক্ষম হলেও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষের অন্তরে একটা চেতনা সঞ্চার করতে তাঁরা সক্ষম হন। অবৈজ্ঞানিক হলেও এখানেই তাঁদের চিন্তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনগুলি অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও তার দ্বারা শ্রেণী-সংঘাতের বাস্তবতা সম্পর্কে একটা মূল্যবান শিক্ষা তারা লাভ করেছিলো। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যে পৃথক এবং এই পৃথক স্বার্থগুলি যে শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী, এ উপলব্ধি তাদের মধ্যে এসেছিলো। এর ফলে পূর্ববর্তীদের কল্পনা-প্রবণতা স্বভাবতই উত্তর-সূরীদের মধ্যে অনেকখানি কমে এসে তাঁদের চিন্তাকে বাস্তবমুখী করেছিলো।

তেরো

জর্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) দ্বন্দ্ববাদ (Dialectics) তত্ত্বগত ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবের সূচনা করে। দ্বন্দ্ববাদ ইওরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন নয়। গ্রীক দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই পদ্ধতি হিসেবে দ্বন্দ্ববাদকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভে দেকার্ত, স্পিনোজা প্রমুখ দু-চারজন ব্যতিরেকে অন্যসব দার্শনিকের চিন্তা ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। হেগেল শুধু যে দ্বন্দ্ববাদের অবতারণা করেছিলেন তা নয়। তাঁর দর্শনে এর ওপর গুরুত্ব পড়েছিলো অপরিসীম। আধুনিক যুগের অধিবিদ্যা-গত চিন্তার মধ্যে বাস্তবমুখিনতার যথেষ্ট অভাব ছিলো। প্রকৃতির গতিশীলতা, ঘটনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি আবিষ্কার এবং তার সম্পর্ক আলোচনার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা তার মধ্যে ছিলো না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে

ডারউইন প্রাকৃতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন, হেগেলের চিন্তা দার্শনিক ক্ষেত্রে অনেকাংশে সেই বিপ্লবের সূচনা করে। ভাববাদী দৃষ্টি ভঙ্গি সত্ত্বেও এখানেই হেগেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তাঁর দর্শনে প্রাকৃতিক, আধিমানসিক, দার্শনিক সমস্ত কিছুকেই এমন একটা চলমান প্রবাহ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যার মধ্যে স্থিতিশীলতার কোন স্থান নেই।

হেগেল সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ এবং ইতিহাসকে মনে করতেন দ্বান্দ্বিক গতি-সম্পন্ন ও বিবর্তনশীল। এই বিবর্তনশীল জগৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে দ্বন্দ্ববাদ ব্যতীত উপায় নেই। ভাববাদী সংস্কারবশে নিজের উত্থাপিত অনেক প্রশ্ন ও সমস্যার যথার্থ জবাব দান তাঁর পক্ষে সম্ভব না হলেও দ্বান্দ্বিক গতিসম্পন্ন জগৎ ও ইতিহাসকে জানার জন্যে দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি আধুনিক দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করেন। এদিকে তাঁর কৃতিত্ব এবং দানকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও হেগেলের ভাববাদিতার ফলে দ্বন্দ্ববাদকে তিনি তার যথার্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ইতিহাস ও প্রকৃতিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হননি। ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি মনে করতেন ইতিহাসে গতিশীলতা ব্যাখ্যার জন্যে প্রয়োজন এক পরম সত্তার। সেই সত্তাকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। এ কথার দ্বারা তিনি অনিত্য ও পরিবর্তনশীল জগতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়ে-ছিলেন এমন এক সত্তার সাথে, যা গতিহীন এবং নিত্য। তাঁর দর্শনের এই স্ববিরোধিতার চরিত্র এবং দুর্বলতা উনিশ শতকীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের ধাক্কায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এর ফলে ইওরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারা আবার অনেকখানি বস্তুবাদের দিকে ফিরে আসে। তবে সে বস্তুবাদের সাথে আঠারো শতকের যান্ত্রিক বস্তুবাদের একটা মৌলিক প্রভেদ ছিল। পূর্ববর্তী বস্তুবাদে সমগ্র ইতিহাসকে হিংসাদ্বেষ পরিপূর্ণ একটা অযৌক্তিক ব্যাপার মনে করা হতো। কিন্তু উনিশ শতকীয় নতুন বস্তুবাদে ইতিহাসকে একটা বিবর্তন হিসেবে দেখে সেই বিবর্তনের নিয়মকানুন আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা গেলো। এই প্রচেষ্টাক্ষেত্রে ডারউইনের প্রভাবও অনস্বীকার্য। এই বিবর্তনবাদে বস্তুবাদ শুধু যে ইতিহাসের ব্যাখ্যাতেই নিযুক্ত হলো, তা নয়। প্রাকৃতিক ইতিহাস, প্রাণীজগতের ইতিহাস ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ঐ একই চিন্তাধারা প্রভাবশীল হলো

এবং বিজ্ঞানের সাথে বস্তুবাদী দর্শনের স্থাপিত হলো একটা নিকট সম্পর্ক।

ইওরোপীয় সমাজ, দর্শন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন আন্দোলনসমূহের উদ্ভবের ফলে প্রয়োজন হলো সমগ্র মানব-ইতিহাসকে নতুনভাবে বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বুর্জোয়া-শ্রমিক সংঘর্ষের ফলে এ সংঘাতের শ্রেণীচরিত্র বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত হলো। হেগেল ঐতিহাসিক গতিকে দ্বন্দ্ববাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে অনেক অধি-বিদ্যাগত সংস্কার থেকে মুক্ত করলেও ভাববাদী প্রভাব তার মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান ছিল। এবার মানবিক বিবর্তন ও ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকেও অধিবিদ্যা নির্বাসিত হলো এবং ভাববাদী বিবর্তনবাদের স্থান দখল করলো ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ।

পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রবাদীরা ধনতান্ত্রিক শোষণের কঠোর সমালোচনা করলেও শোষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে তাঁরা সক্ষম হননি এজন্যে শোষণ বন্ধ করার প্রকৃত পথনির্দেশের ক্ষমতাও তাঁদের আয়ত্তের বাইরে ছিলো। ধনতন্ত্রবাদী শোষণের অপরিহার্যতা সম্পর্কেও তাঁদের কোন ধারণা ছিলো না। ধনতান্ত্রিক শোষণকে তাই তাঁরা তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারেননি। এ ছাড়া, ধনতান্ত্রিক শোষণের সত্যিকার চরিত্র সম্পর্কেও তাঁদের কোন ধারণা ছিলো না। একমাত্র 'উদ্‌বৃত্ত মূল্যে'র আবিষ্কারের পরই এ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা সম্ভবপর হয়। এর ফলে দেখা যায় যে, প্রকৃত শোষণের বস্তু হচ্ছে প্রত্যেক শ্রমিকের অতিরিক্ত শ্রমশক্তি। একটি শ্রমিক একদিনে যত ঘণ্টা কাজ করে, তার পূর্ণ প্রতিদান সে পায় না। অর্থাৎ সে যে পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করে এবং যে পরিমাণ পারিশ্রমিক তাকে দেওয়া হয়, তার মধ্যে অনেক ব্যবধান। এবং এই উদ্‌বৃত্ত শ্রমমূল্যই শোষণের সত্যিকার সামগ্রী। প্রচলিত হার অনুসারে অথবা তার থেকে কিছু উচ্চ হারে শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দিলেও এ কথা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষ আসলে অন্য মানুষের শ্রম-শক্তিকেই শোষণ করে। এঙ্গেল্‌স্ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং এই উদ্‌বৃত্ত শ্রমমূল্যের তত্ত্ব কার্ল মার্ক্সের নিজের আবিষ্কার এবং এই দুই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা এবং কল্পনার হাত থেকে মুক্ত হয়ে একটা সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়।